পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহ তা

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র

(মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জীবনী)

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রণীত—

মূল্য এক টাকা চারি আনা

ঢাকা

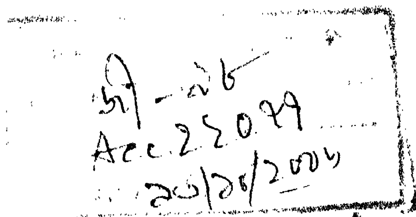
১৫নং বাংলাবাজার হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

এজেন্ট :—

কলিকাতা	ঢাকা
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড্ কোং	স্কুল সাপ্লাই কোং
বীণা লাইব্রেরী	মডেল লাইব্রেরী
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন	আলবার্ট লাইব্রেরী
বরেন্দ্র লাইব্রেরী	ময়মনসিংহ
ইণ্টার ন্যাসনেল বুক ডিপো	মডেল লাইব্রেরী
২৭নং হ্যারিসন রোড্	ভট্টাচার্য্য এণ্ড্ কোং



কলিকাতা

১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীটস্থ

বিদ্যোদয় প্রেস হইতে

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা।

আজ পর্য্যন্ত জগতে কত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কতলোকের মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মত মহাপুরুষের আবির্ভাব জগতের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। এই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিবার মত সামর্থ্য এ দীন জীবনীকারের নাই। তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় এত আছে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সম্যক অবগত হওয়াই অসম্ভব। তথাপি যতদূর সম্ভব তাঁহার জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজ, রাজনীতি, দেশের সঙ্গে তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল, জগতে যে যে কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠানে এবং যে যে উচ্চ মনোবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা তিনি বরেণ্য হইয়া সকলের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার কতকটা আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। আমার অক্ষমতাপ্রযুক্ত হয়ত ইহাতে বহু ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। সুধী ও সজ্জন সমাজ তাহা মার্জ্জনা করিলে কৃতার্থ হইব।

কাশিমবাজার রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে, তাহা এবং খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্যও দেওয়া হইয়াছে।

'ভারতীয় সাধনা' সম্পর্কে মহারাজার বিষয় যে অংশগুলি " " চিহ্ন দ্বারা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত এম-এ, মহাশয়ের সম্পাদিত "ভারতের সাধনা" নামক মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহারাজার সম্বন্ধে পরিশিষ্টে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার, শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ 'উপাসনা' হইতে এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখিত প্রবন্ধ 'সঞ্জীবনী' হইতে

গৃহিত হইয়াছে। 'ভারতের সাধনা', 'উপাসনা' ও মহারাজার অন্যান্য জীবনীকারের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মহারাজার প্রসিদ্ধ টাউন হল বক্তৃতা ইংরাজিতে অবিকল প্রকাশ করা হইল। ইহার বঙ্গানুবাদে ভাবের গভীরতা কমিয়া যায় বলিয়া অনেকের ধারণা।

বইখানি বড় তাড়াতাড়ি ছাপা হইয়াছে সুতরাং অনেক ভুল থাকিয়া গেল। পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংশোধন করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

মহারাজার বিয়োগ বেদনা ভুলিবার নহে, যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানুষের হৃদয়ে মহারাজার পুণ্যস্মৃতি অমর হইয়া বিরাজ করুক।

৯ই পৌষ ১৩৩৬
মহুয়া।

গ্রন্থকার।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ফেলো

বিদ্যোৎসাহী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র

মহারাজা

মণীন্দ্র চন্দ্র



—"নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী"—

- মধুসূদন—

বেদনার তর্পণ

স্বপ্ন সায়রের কূলে কাহার সুমধুর বাঁশরীলহর একবার ঝঙ্কারিয়া উঠিয়াই সহসা থামিয়া গেল্।—আকাশে পবনে সেই বাঁশরী সুতান ভাসিয়া আসিয়া ক্ষণিকের তরে মর্ত্ত্যবাসীকে মুগ্ধ পাগল করিয়া তুলিয়াছিল আজ আবার সেই কণ্ঠহারা সঙ্গীতের স্মৃতির পরশে সেই মর্ত্তবাসী মুহ্যমান ও শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আজ ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গিয়াছে—হাহাকারের বেদনায় প্রকৃতির বুক ভরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু বাংলা দেশের বুকের অশ্রুসায়র শুকাইয়া গিয়াছে সেই শুষ্ক অশ্রুসায়রের কূলে দাঁড়াইয়া সপ্তকোটী বাঙ্গালী আজ ক্রন্দনের আকুল ধ্বনিতে বাঙ্গালার দানবীরের উদ্দেশ্যে শুধু অশ্রুহীন বেদনার তর্পণ করিতেছে। দুর্ভাগা বাঙ্গালাদেশ—

যাহা কিছু গৌরবের, যাহা কিছূ আদর্শের, যাহা কিছু প্রতিষ্ঠার ছিল সবই চলিয়া গেল—'উজ্জ্বলিত নাট্যশালার দীপাবলী' যেন প্রমত্ত ঝড়ের এক নিশ্বাসে নিবিয়া গেল, ঐক্যতান থামিয়া গিয়া, আনন্দ কোলাহল বিষাদের অতলজলে সমাধি লাভ করিল।

বাঙ্গলাদেশের এ দুর্ভাগ্য নূতন নহে, অপ্রত্যাশিত নহে, অচিন্ত্যনীয় নহে। যুগপ্রভাবের মধ্য দিয়া শ্রীভগবানের করুণা-ধারা রূপে তাঁহার যে শ্রেষ্ঠদান মর্ত্ত্যলোকের উপর বর্ষিত হয়, সাত্বিকতা ও সাধনার উৎকর্ষ হইতে বঞ্চিত হইলে যথার্থভাবে এই দান গ্রহণ করিবার অথবা গ্রহণ করিতে পারিলেও রক্ষা করিবার সামর্থ্য কোন দেশের থাকে না। যুগ তখন সর্ব্বমানবের প্রাণের বস্তু, ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপহার শিরে বহন করিয়া আর এক দেশের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়ায়। সে দেশে তখন আবার বাঁশরী বাজে, আবার সঙ্গীতের সুধাতান উঠে, আবার হাসি ফুটে।—অফুরন্ত উৎসব ও প্রচুর আনন্দ সে দেশের প্রকৃতির প্রাণে সত্যকারের চেতনা জাগাইয়া তুলে।

আঘাতের পর আঘাতে শক্তির হানি হয়। সহ্যশীলতা জীবনের মূলভিত্তি দৃঢ় করিয়া রাখিলেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা দেশের আর থাকেনা। এই সেদিন দেশবন্ধুর তিরোধান, আশুতোষের মহাপ্রয়াণ, সুরেন্দ্র নাথের বিয়োগ—অভাগা বাংলা দেশের বুকে আর কত সহিবে? চারিদিকে তামস তাহারই মধ্যে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা,—দেশের বুকের উপর উন্মত্তহাস্যে মৃত্যু-দূতেরা অহর্নিশি তাথৈ তাথৈ নৃত্যের তালে তালে মরণ

সঙ্গীত গায়—বাঙ্গালা দেশের বুকে আর কত সয়! আর কত সয়!!

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এদেশে ভগবানের চরম এবং পরম আশীর্ব্বাদের ন্যায় আসিয়াছিলেন। যুগধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রকৃত শ্রদ্ধাসূচক সম্বোধন করিতে হইলে তাঁহাকে যুগাবতার বলিতে হয়। এবং তাহাতে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ করা হয় না। যুগ এই শ্রেষ্ঠরত্ন বাঙ্গলা দেশের জন্য উপহার আনিয়াছিল। অভিশপ্ত বাঙ্গালী জাতি সত্য সাধনা এবং যুগধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় এই মহনীয় রত্ন জাতির অন্তঃস্থল হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। গৌরবের আলোকচ্ছটা নিভিয়া গিয়াছে অদূর ভবিষ্যতে আবার সেই আলোকরশ্মি ফুটিয়া উঠিবে কিনা কে বলিতে পারে!

জন্ম কথা

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র দম্পত্তির আশার আলোক উজ্জ্বল করিয়া প্রাচীন গৃহের ভগ্ন দেউলের ছিন্ন ছায়াতলে রমণীগণের উলুধ্বনির কোলাহলে মনীন্দ্রচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। কে জানিত এই অনাড়ম্বড়-জাত শিশু একদিন দেশের ও দশের মধ্যে বরেণ্য—শুধু বরেণ্য নহেন প্রাতঃস্মরণীয় হইবেন! কে জানিত এই দরিদ্রের কোল আলো করা শিশু উত্তরকালে একদিন সমগ্র দরিদ্রের তুঃখ মোচনের জন্য ধন, মান, জীবন উৎসর্গ করিবেন! কে জানিত জগতের মঙ্গল কর্ত্তা, বিশ্বহিতের জন্য এই শিশুর বুকে সমস্ত দরিদ্রের ব্যথা বুঝিবার শক্তি দিয়া

তাঁহাকে এক দরিদ্রের ঘরে প্রেরণ করিয়াছিলেন! প্রকৃতির কি বিচিত্র লীলা—

—'উৎসবে তার আসে নাই কেহ
বাজে নাই বাঁশী সাজে নাই গেহ'—

এমনি দরিদ্র পিতামাতার গৃহে যিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন তাঁহারই সুখ দুঃখ একটা বিরাট জাতির সুখ দুঃখের সহিত নিরবচ্ছিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই বোধ হয় আজ তাঁহার তিরোধানে তাঁহার নিজ পুত্র পরিজনের যত ক্ষতি হইয়াছে তাহার সহস্র গুণ অধিক ক্ষতি হইয়াছে সেই জাতির যে জাতির মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাদের মধ্যে তিনি নিজকে রিক্ত করিয়া বিলাইয়া দিয়াছিলেন—যাহাদের জীবনতন্ত্রীর সহিত তাঁহার জীবনতন্ত্রী একই সুরে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। শুধু জাতির মঙ্গল কামনায় নহে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন বিচার করিয়া তিনি কাহারও কল্যাণ চিন্তা করিতেন না। এই জন্যই তিনি সকলের হৃদয় সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং এইজন্যই তাঁহার তিরোধানে আজ সমগ্র বাঙ্গালী এত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মহাপুরুষ নামের সার্থকতা জাতির এই অসামান্য শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হিন্দুগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী। শুনা যায় যে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদির একত্র যোগাযোগ জাতকের ভাগ্যে

রাজযোগের সূচনা করে মনীন্দ্রচন্দ্রের জন্মকালে ঠিক সেইরূপ যোগাযোগের সমাবেশ হইয়াছিল। কোন এক জ্যোতির্ব্বিদ তাঁহার জাতলগ্ন ও গ্রহসমাবেশ পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে দরিদ্র সন্তানের যে রাজযোগ সংঘটিত হইলে তাহার জীবন সম্বন্ধে কোন আশা রাখা যায় না, মহারাজা সেইরূপ রাজযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ;—সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন যে যদি কোন প্রকারে তিনি জীবননাশক একটি রিষ্ট অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন তবে তাঁহার সিংহাসনলাভ অনিবার্য্য। হিন্দু জ্যোতিষের উপর যাঁহাদের আস্থা কম, একবার তাঁহারা বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক মহারাজার জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন জ্যোতির্ব্বিদ কি তীব্র ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজা আজ ইহ জগতের পরপারে খেয়া পাড়ি দিয়াছেন—সেই ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতির্ব্বিদও হয়ত আর ইহ জগতে নাই কিন্তু মহারাজের বিরাট কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাস জ্যোতিষীর উক্তির চরম সত্য রক্ষা করিয়া বিরাজ করিতেছে।

শুধু দরিদ্রের গৃহেই নহে, মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই অফুরন্ত মাতৃস্নেহ ও পিতার আদরযত্ন ভিন্ন তাহার মর্ত্ত্যলোকে অন্য কোন অবলম্বনই ছিল না। দরিদ্রের স্নেহ!—অনিচ্ছাকৃত অনাদরে ধূলি শয়ান শিশু, ক্ষুধার তাড়নায়

শুষ্ককণ্ঠে ক্রন্দন করিতেছে—একা ঘরে জননী তার গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা—উদারান্নের সংস্থানের জন্য পিতা তার আশার দ্বারে দ্বারে মরীচিকামুগ্ধের মত ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে—জঠরে জ্বালা—কণ্ঠে তৃষ্ণা—উপার্জ্জন করিয়া গৃহে আনিতে পারিলে শিশু পুত্রের মুখে এক ফোঁটা দুগ্ধ দেওয়া যাইবে নতুবা—অন্য কোন উপায় নাই।

বাল্য ও কৈশোর

দিন যায়। এমনি করিয়া সুখে দুঃখে হাসি কান্নায় যে জীবন গঠিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল তাহার উপর সহসা একদিন ভগবানের রুদ্ররোষানল বর্ষিত হইল। স্নেহের উৎস, করুণার আধার দরিদ্র জীবনের একমাত্র অবলম্বন মাতা সহসা মৃত্যুর আহ্বানে সন্তানের মমতা পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন লোকের সন্ধানে চলিয়া গেলেন। হায়রে কঠোর আহ্বান! তোমার ঈঙ্গিতে ব্যাকুল হইয়া সন্তানেরও মমতা পরিত্যাগ করিয়া জননী চলিয়া যায়, এক মুহূর্ত্তও সন্তানের কি হইল দেখিয়া যাইবার অবকাশ পায় না! এই সৃষ্টি! এই জগত! এই পিতৃ মাতৃস্নেহের ঐহিক পরিনতি!

দুই বৎসরের মণীন্দ্র চন্দ্র নিরাবলম্ব হইয়া একমাত্র পিতার স্নেহ শীতল ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। নিরুপায় পিতা! সংসার, উপার্জ্জন, আহার, সন্তান পালন অনেক কিছুই তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য। তবু পিতা সব ত্যাগ করিয়া একমাত্র পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অকুল সাগরে ভাসিলেন। তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান, ধারনা সবই একমাত্র পুত্রপরিপালনে পর্য্যবসিত হইল। হাটিয়া যাইতে পুত্র আছাড় খাইয়া পড়েন, গৃহকর্ম্মরত পিতা ছুটিয়া আসিয়া বুকের মানিককে বুকে তুলিয়া লন। খেলিতে খেলিতে অবোধ বালক কাঁদিয়া উঠে, আহার নিরত

পিতা উদ্দত অন্নগ্রাস পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লন। বিধাতার বিচিত্র নিয়মে এইরূপ নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও এবং নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্য্যয় ও নানা ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও মণীন্দ্রচন্দ্র ক্রমে ক্রমে চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিতেছিলেন। কেহই তখন ভাবিতে পারেন নাই যে ততটুকু সুখও এ জীবনে শাশ্বত নহে—ইহার পরে ইহাপেক্ষা আরও কঠোর পরীক্ষা আছে এবং ইহাপেক্ষাও আরও কঠোরতর দুর্ভাগ্য এই শিশুকে গ্রাস করিবার আশায় রসনা বিস্তার করিয়া আছে। প্রকৃতির লীলা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। এক দুশ্ছেদ্য প্রহেলিকার মত মানব জীবনের মহাসত্যকে কে এবং কেন যে এমন নিপুণ ভাবে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহা বোধ হয় আজও পর্য্যন্ত জগতের কেহ নিরাকরণ করিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মণীন্দ্রচন্দ্রের অদৃষ্টাকাশে যে খণ্ডমেঘরাজি সঞ্চারণ করিতেছিল তাহা একসঙ্গে জমাট বাঁধিয়া দুর্ভাগ্যের বায়ু তাড়নায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তারপর ঝড় উঠিল—এই ক্ষুদ্র বালকের জীবন লইয়া নিষ্ঠুর নিয়তির কন্দুক ক্রীড়া চলিতে লাগিল। তারপর একদিন বালকের ইহ পরলোকে একমাত্র গতিরূপে যিনি একাধারে পিতা ও মাতার স্নেহদান করিয়া বালকের জীবন রক্ষা করিতেছিলেন—কালের কঠোর অনুজ্ঞায় নির্ম্মমের মত তিনি বালক পুত্রকে নির্ব্বান্ধব করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। দরিদ্র দম্পতির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, দারিদ্র্য

ও দুঃখ সহিয়া শুধু একমাত্র পিতার স্নেহাভিষিক্ত হইয়া যিনি বাঁচিয়া ছিলেন আজ পিতৃবিয়োগে এই বিরাট জনবহুল বিশ্বে তিনি অনাথ হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার কেহই নেই।

কিন্তু উপর্য্যুপরি দারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তিনি প্রকৃতির নিয়মে বাঁচিয়া থাকিলেন। যাঁহার অদৃষ্টে বিশ্বের ভাগ্যনিয়ন্তা অপরিসীম রাজ্যসুখ, অতুলনীয় খ্যাতি, অগণ্য জনবল এবং কুবেরের তুল্য সম্পদ লিখিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহার জীবন তন্ত্রীর করুন সুরের সঙ্গে ভারতের অগণিত গৃহহীন, ধনহারা কাঙালগণের জীবনসঙ্গীতের সুর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছায় মণীন্দ্রচন্দ্রের কোন হানিই হইল না; পরন্তু তিনি উত্তরকালের মান সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতিপত্তির যোগ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখাইতে লাগিলেন।

কাশীমবাজার রাজবাটীতে গমন

এখন শ্যামবাজারের যে স্থানে (২০নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট) গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই স্থানেই তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। পিতার মৃত্যুর পর অনাথ হইয়া ইনি স্বীয় মাতুল কাশিমবাজারের রাজা স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের রাজবাটী কাশিমবাজারে চলিয়া আসেন। তখন পর্য্যন্তও কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে এই অনাথ বালকের অদৃষ্টে কাশিমবাজার রাজের বিরাট সম্পত্তি

চলিয়া আসিবে। মাতুলের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া ইনি বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং যথাসময় প্রবেশিকা ও ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

এই সময় তাঁহার আবার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে এবং তিনি মাতুলের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হন। এই সময় কাশিমবাজার রাজবাটীতে সম্পত্তি তত্ত্বাবধান লইয়া সামান্য গোলযোগ চলিতেছিল। ১৮৪৪খৃঃ অক্টোবর মাসে মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতুল কাশীমবাজারাধিপতি রাজা কৃষ্ণনাথ অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানি উইল দ্বারা তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি কোম্পানী বাহাদুরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী ও উত্তরাধিকারিণী মহারাণী স্বর্ণময়ী কোম্পানীর হাতে কিছুদিনের জন্য সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং ঐ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য কোম্পানী বাহাদুরের নামে সদর দেওয়ানী আদালতে এক মোকর্দ্দমা চালাইতে থাকেন। এই সময় রাজীব লোচন রায় নামক এক সূক্ষ্মদর্শী চতুর বিষয়কৌশলী ব্যক্তি মহারাণীকে এই মোকর্দ্দমা পরিচালনায় বিশেষরূপ সাহায্য করায় ১৮৪৭ খৃঃ, ১৫ই নভেম্বর তারিখে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মহারাণী স্বর্ণময়ী জয়লাভ করেন। উইল করিবার সময় রাজা কৃষ্ণনাথ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না ইহা সপ্রমান করায় উইল সম্পূর্ণ নামঞ্জুর হইয়া যায় এবং মহারাণী সম্পত্তিতে স্বীয় অধিকার ফিরিয়া পান।

এই মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য মহারাণীকে বিস্তর ঋণ করিতে হইয়াছিল। সম্পত্তির উত্তরাধিকার ফিরিয়া পাইয়া ইনি দেওয়ান রাজীব লোচন রায়ের সহযোগীতায় সম্পত্তির আয়বৃদ্ধি এবং ব্যয় সংক্ষেপ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা ছিল যে মহারাণীর মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রদের হস্তে চলিয়া আসে। এজন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেছিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্র যখন কাশিমবাজার রাজবাটীতে তখন এই সকল লোক তাঁহাকে স্বার্থসিদ্ধির পরিপন্থী মনে করিয়া অত্যন্ত বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন; এবং সুযোগ সুবিধা পাইলেই অত্যন্ত নির্য্যাতন ও অনাদর করিতেন।

রাজবাটী পরিত্যাগ—বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

যে সংসারে কোথাও এতটুকু সহানুভূতি নাই, সমব্যথা নাই, দুঃখে সান্ত্বনা সুখে উল্লাস নাই সে সংসারে রাজৈশ্বর্য্য থাকিলেও মানুষ বাস করিতে পারে না। রাজসংসারে রাজৈশ্বর্য্য থাকিলেও মণীন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে এই সময় দারিদ্র্যই সমধিক বরণীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং শ্যামবাজারে থাকিয়া ক্রমশঃ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই

সময়ে তিনি যে দুঃখভোগ করেন তাহা অবর্ণনীয়। যাঁহার জন্য ভগবান রাজ্যসুখ নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন—ভবিষ্যতে যিনি 'মহারাজা' হইয়া সহস্র সহস্র অন্নহীনের মুখে অন্ন, তৃষ্ণাতুরের মুখে জল দান করিয়া বিধাতার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, আজ তিনিই একমুষ্টি অন্নের প্রত্যাশী—ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে !

কাশিমবাজার রাজবাটীতে অবস্থানকালীন বাজবাড়ীর সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্তও মণীন্দ্রচন্দ্রকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিত না। 'পরাণ খানসামা' নামক একজন ভৃত্য মহারাজের প্রতি তৎকালে বিশেষ বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। ভৃত্য হইলেও রাজসংসারে পরাণের কিছু প্রতিপত্তি ছিল এবং বোধ হয় সেই জন্যই তুচ্ছ ক্ষমতার অহঙ্কারে পরাণ মণীন্দ্রচন্দ্রকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না। উত্তরকালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এই পরাণকেই আপনার প্রধান খানসামা নিযুক্ত করিয়া তাহার তীব্র প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে মণীন্দ্রচন্দ্র বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ পশুপতি বসু মহাশয়ের বাটীতে আহার করিতেন। বি, এ, পাশ করিলেও কলিকাতায় বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা না পাইলে উপযুক্ত কার্য্য পাওয়া সহজ নহে। মণীন্দ্রচন্দ্র কোন প্রকার চাকুরী বা উপার্জ্জনের পন্থাও অবলম্বন করিতে পারেন নাই। দুঃখ যখন আসে তখন সুখের ধারণা

মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ না করিয়া যায় না। অন্ধকার অসহ্য হইলেই লোকের আলোকের কথা মনে পড়ে। দুঃখের যন্ত্রনা যখন মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন মানুষ সুখের অভাব অনুভব করে—এবং বোধ হয় সেই সময়ই দুঃখের দিন ফুরাইয়া যাইবার একটা মেয়াদ। মণীন্দ্রচন্দ্রের দুঃখের অবসান ঘটিবার সময় হইয়া আসিয়াছিল, কারণ এই সময় তিনি জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন। একস্থানে ভোজন, একস্থানে শয়ন—ইহাপেক্ষা মানব জীবনে আর কি দুঃখ হইতে পারে! নিয়তি তাঁহার জীবনের কুলে দাঁড়াইয়া হাস্য করিতেছিলেন বটে কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা তখন তাঁহার অদৃষ্টসূত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিতেছিলেন। কালরাত্রির অবসানে তাঁহার জগতে নবীন উষার অরুণ কিরণ সম্পাত হইবার দিন ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল।

রাজ্য লাভ

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী পরলোক গমন করেন। হিন্দু আইন অনুসারে মহারাণী অপুত্রক বলিয়া কাশিমবাজারের সম্পত্তি মহারাণী স্বর্ণময়ীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী রাণী হরসুন্দরীর হস্তে চলিয়া যায়। রাণী হরসুন্দরী এই সময় বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের উদ্দেশ্যে কাশীধামে বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণতলে জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকার তাঁহার হস্তে আসিলে তিনি শেষজীবনে ধর্ম্মকর্ম্ম এবং কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া পুনরায় বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে অস্বীকৃত হন এবং স্বীয় দৌহিত্র এবং একমাত্র উত্তরাধিকারী মণীন্দ্র চন্দ্রকে আনাইয়া তাঁহাকেই আপনার সমস্ত সম্পত্তির মালীক করিয়া দেন।

এইরূপ ৩৮ বৎসর বয়সে কাশিম বাজারের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া মণীন্দ্র চন্দ্র রাজবাটীতে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কাশিম বাজারের 'মহারাজা' বলিয়া স্বীকার করেন। শোনা যায়, এই সময় পর্য্যন্তও তাঁহাকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর যাহার সহায়,

মানুষের সকল ক্ষমতাই সেখানে ব্যর্থ। ক্রমে ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নবীন ভূম্যাধিকারীরূপে মহোৎসাহে কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যলাভের পরই তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর বিশ্বস্ত এবং হিতৈষী কর্ম্মচারীবর্গ ও অন্যান্য পরিজন গণকে সমাদর ও সম্মান দ্বারা বিস্মিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলের প্রাণেই মহারাজা সম্বন্ধে নবীন আশার ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

মহারাজা বাহাদুর উপাধি

মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট ভারত সরকার তাঁহার উত্তরাধিকারীকে 'মহারাজা' উপাধি দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। মহারাণীর পরলোক গমনের পর তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মনীন্দ্র চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণশালী ও সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হওয়ায় ভারত সরকার পরম সন্তুষ্টচিত্তে এবং সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে মনীন্দ্র চন্দ্রকে 'মহারাজা' উপাধীতে ভূষিত করিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে কঠোর জীবন সংগ্রামে জয়ী মনীন্দ্র চন্দ্র কাশিম বাজারের 'মহারাজা বাহাদুর' হইলেন।

এই সুখ সৌভাগ্য লাভ করিবার পূর্ব্বে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জন্ম মৃত্যুর সংগ্রামের মত যে কি বিরাটসংগ্রাম মনীন্দ্র চন্দ্রকে করিতে হইয়াছিল তাহা তাঁহার জীবনী লইয়া

সুচারুভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এমন দিন তাঁহার যৌবনে গিয়াছে যে তিনি আর কোনকালে জীবনে সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিবেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইত। এই চরম তুর্দ্দশার কালে যাহারা মহারাজের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের কথা মহারাজ ইহ জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। নিজের স্বার্থ তিনি কোন দিনই লক্ষ্য করিতেন না বটে কিন্তু যে স্থলে নিজের সামান্য স্বার্থ রক্ষা করা প্রয়োজন, তাঁহার অতীত দরিদ্র জীবনের সহানুভূতিশীল বন্ধুজনের ও উপকারীগণের আবশ্যকে তিনি সেই সামান্য স্বার্থ টুকুও অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই মহাপুরুষের লক্ষণ। যে স্বার্থটুকু রক্ষা করিলে নিজের কল্যাণ হয় অথচ পরের কোন অনিষ্টই হয় না অপরের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ভাবে নিজের এই লাভটুকু অর্জ্জন করিতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন। জগতের প্রায় সকল মহত্ত্বেরই তুলনা পাওয়া যায় কিন্তু এরূপ মহানুভবতার তুলনা বর্ত্তমান শতাব্দীতে নিতান্ত বিরল বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

সৌভাগ্য ও রাজ্যসুখ প্রাপ্তির পরও তাঁহার পূর্ব্ব মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য যেন তাঁহার নিকট স্রোতের তৃণের ন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছিল, মনের উপর সত্যকারের কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই। মহারাজা হইবার পর কলিকাতা হইতে তাঁহার কতিপয়



বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কাশিম বাজার গিয়াছিলেন। তিনি অপ্রমেয় বিত্তাধিকারী ও মহারাজ হইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহারা প্রত্যেকেই মনে মনে অনেকটা কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তাঁহাদের সে কুণ্ঠা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া যায়। তাঁহারা দেখিলেন মহারাজের পূর্ব্ব প্রকৃতি কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই বরং লক্ষ্মীর কৃপার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকৃতি আরও কোমল এবং আরও মধুর হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে জমি দান

এই বন্ধুবর্গ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। এবং সাহিত্য পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী একটু স্থান প্রার্থনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। মহারাজা তাঁহাদের প্রার্থনা অপ্রত্যাশিতরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখন যে স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবন আছে ঐ স্থান মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রই সাহিত্য পরিষদে দান করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই দানই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার বিরাট দানের সূচনা করিয়াছিল। উত্তরকালে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় মহারাজার এই দান উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "তাঁহার সকাশে গিয়া আমাদের আশা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যে পরিমাণ

প্রত্যাশায় তাঁহার সকাশে গিয়াছিলাম তিনি তাহার সমধিক দান করিলেন !”

সাহিত্যের প্রসারকল্পে এই দানই হয়ত তাঁহাকে যুগ যুগান্তর অমর করিয়া রাখিত। কিন্তু ইহাই তাঁহার দানরত জীবনের সূচনামাত্র। পরবর্ত্তীকালে এই দানের পরিমাণ পাঁচকোটী টাকারও উপর হইয়াছিল।

প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর তিরোধানের পর তাঁহার শূন্যস্থান কতকটা মহারাণী স্বর্ণময়ী পূর্ণ করিয়াছিলেন। দয়া-দাক্ষিণ্যে ও দানশীলতায়, বিনয়ে ও আড়ম্বরশূন্যতায়, ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও সাধারণ হিতকর কার্য্যে, ঔদার্য্য ও মহানুভবতায় মহারাণী স্বর্ণময়ী তৎকালে সমগ্র বাঙ্গলা দেশের বরণীয়া ছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র সেই বংশের উত্তরাধিকার লাভ করিয়া শুধু যে তাঁহার ধনজন ও ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন তাহা নহে পরন্তু তিনি তাঁহার সমস্ত সদ্‌গুণ-রাজীই লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সাম্মলন

১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে ইঁহারই উদ্যোগে কাশিম বাজারের রাজবাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। মহারাজা এই সময় অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা সম্মিলনীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া

সকলের নিকট ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। লোকজনের আদর আপ্যায়নের জন্য তাঁহার একটী স্বভাবসৌজন্য ছিল। এই বিরাট সাহিত্য-যজ্ঞে যে সকল হোতৃবৃন্দ কাশিমবাজারের রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন যথার্থ রাজোচিত বিনয়, সৌজন্য এবং আপ্যায়ন দ্বারা তিনি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেককেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আহার, বিহার, বিরাম বিশ্রাম প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উপর পর্য্যন্তও মহারাজা লক্ষ্য রাখিতে ত্রুটি করেন নাই।

সাহিত্যিকগণের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের হৃদিভাব বিনিময়, দেখা সাক্ষাৎ এবং প্রত্যক্ষভাবে আলাপ পরিচয়াদির সুযোগ ঘটাইবার জন্যই মহারাজা স্বয়ং বিপুল অর্থব্যয় দ্বারা এই সাহিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুষ্ঠান সফল এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল। ১৯০৭ সাল হইতে আজ পর্য্যন্তও প্রতিবৎসর বাঙ্গলার স্থানে স্থানে এই সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া তাঁহার গৌরব রক্ষা করিতেছে।

কর্ম্মক্ষেত্র

১৯১০ সালে ইনি বঙ্গদেশীয় জমিদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তথায় পূর্ণকাল কার্য্য করিবার পর সমস্ত

বেসরকারী সদস্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নিয়োজিত হন। এই সময় রাউলাট বিলের আলোচনা কালে তিনি উক্ত বিলের সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কোন জমিদার সদস্য বিপুল জমিদারী ভোগ করিতে করিতে সরকারের কার্য্যে এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। তিনি এরূপ তেজস্বিতা ও সাহসিকতা এবং নির্ভীকতার সহিত তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তৎকালে তাঁহার সহকর্ম্মী জমিদার সদস্যগণ সকলেই তাঁহার উক্তিতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

রাষ্ট্রীয় সভার সদস্য

১৯১৯ সালে মণ্টফোর্ড সংস্কার কার্য্যকরী হইবার পর, নূতন আইন অনুসারে তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন, এবং তথায় তিনি নির্ভীকভাবে দেশের ও দেশবাসীর জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

মহারাজার পরলোক গমনে বাংলা দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ করা যায় না। বাংলা দেশের জমীদার শ্রেণীর মধ্যে তিনি প্রকৃত জমিদার এবং প্রকৃত ভূম্যধিকারী ছিলেন। প্রজানুরঞ্জন তাঁহার প্রকৃতিগত মহৎগুণ ছিল এবং অন্য গুণাবলীর কথা আলোচনা না করিলেও বলা

যায় যে একমাত্র এই প্রজানুরঞ্জন দ্বারাই তিনি বরণীয় হইতে পারিতেন। তিনি রাজপুত্র ছিলেন না, এমন কি রাজবংশেও তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই, তবে তাঁহার ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত ছিল—কাশিমবাজার রাজবংশের কন্যা তাঁহার জননী ছিলেন।



রাণী ভবানী

এই কালের বাংলা দেশের জমীদার বংশাবলী এবং তৎ তৎ বংশোদ্ভুত জমীদারগণের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যাঁহারা নিজ নিজ মহত্ব দ্বারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। নাটোরের রাজবংশাবতংশ সাধক চূড়ামণি মহারাজা রামকৃষ্ণ নাটোর রাজের পোষ্যপুত্র ছিলেন। ভারত বিখ্যাতা মহারাণী ভবানী বগুড়া জেলান্তর্গত ছাতিন গ্রাম নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক অতি সামান্য গৃহস্থ পরিবারের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বালিকা জীবনে কেহ কখনও স্বপ্নে ধারণা করিতে পারেন নাই যে তিনি 'বায়ান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন' হাজার টাকা কেবলমাত্র রাজস্ব দানে 'অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী' রূপে অর্দ্ধ শতাব্দীরও উপরে নিয়ত দান ধ্যান ও পরোপকার করিয়া ধরণীর অশেষ কল্যাণ সাধন করতঃ বাংলা

দেশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গৌরব রূপে নিখিল হৃদয় সিংহাসনে বিরাজ করিবেন। কেবলমাত্র দান ধ্যানই নহে, কেবলমাত্র পরহিত ব্রতই নহে ; শাসন সংরক্ষণ এবং রাজ্য পরিচালনাতেও তিনি যে অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা এবং সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনাও অতি বিরল। শুনা যায় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, শেঠ জগৎ শেঠ প্রমুখ বাংলার সমস্ত জমীদারগণ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠী ওমরাহগণ যখন বঙ্গেশ্বর তরুণ সিরাজের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং পুণ্যশ্লোকা মহারাণী ভবানীকে এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্র সমর্থন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তখন তিনি নির্ভীকভাবে ও সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিতচিত্তে মিলিত শক্তির এই হীন কার্য্যপ্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ষড়যন্ত্র কার্য্যে পরিণত করায় বাধা দান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাঁহার এই মহান প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হইলে বাংলার ইতিহাসের সহিত তাহার পাতায় পাতায় এই ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের কালিমালিপ্ত কলঙ্ককাহিনী বিজড়িত থাকিত না। সামান্য পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া, দারিদ্র্যের শাকান্ন ভোজন এবং দারিদ্রের আবেষ্টনীর মধ্যে বসবাস, পরদুঃখের নগ্ন চিত্র দর্শন—বাল্য জীবনের এই সকল মর্ম্মদাহী অভিজ্ঞতা হইতে উত্তরকালে তিনি মানব জীবন ও মানব দুঃখ সম্বন্ধে যে কিরূপ জাগ্রত হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

মহারাণী স্বর্ণময়ী

মহারাণী স্বর্ণময়ীও সামান্য গৃহস্থের কন্যা। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে এক দরিদ্র দম্পতির কোল আলো করিয়া এই রাজগুণসম্পন্না মহিয়সী মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কপালে তাঁহার রাজটীকা দিয়া বিধাতা তাঁহাকে নিখিল হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী করিয়া মর্ত্ত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাই রাজা লোকনাথ অদৃষ্ট পুরুষের অলক্ষিত ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া সমগ্র বাংলা দেশের মধ্য হইতে এই ক্ষুদ্র পল্লীর প্রফুল্ল সরোজসদৃশ রমণীরত্নকে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" শাস্ত্র বাক্যানুযায়ী সামান্য গৃহস্থের কুটীর হইতে পরম সমারোহ ও সমাদরের সহিত আনয়ন করিয়া সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিণীর অধিকার দান করিয়া যান। মহরাণী স্বর্ণময়ীও আপনার হৃদয়ের অতুল এবং অফুরন্ত করুণা এবং মহত্ত্ব নির্ব্বিশেষে প্রার্থী জনগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দান, ধ্যান, পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা তিনিও সমগ্র দেশের যে কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন জমীদারই অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

মহারাণী ভবানীর ন্যায় তিনিও বাল-বিধবা ছিলেন। তাঁহার স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ (মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতুল) অজানিত কারণে অতি তরুণ বয়সে আত্মহত্যা করেন। যখন তিনি আত্মহত্যা করেন তখন নানা আভ্যন্তরীণ কারণে রাজ-

সংসারের অবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ নিয়ত দানধ্যান ও ব্যয়শীলতার জন্য রাজসংসারে আর্থিক অবনতির সূচনা দেখা গিয়াছিল। রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিবার সময় স্বকীয় সমস্ত সম্পত্তি কেবল মাত্র মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্ত্রীধন ও অলঙ্কার বাদ রাখিয়া কোম্পানী বাহাদুরের নামে উইল করিয়া যান। বলা যায় না তিনি কেন এরূপ কার্য্য করিয়া নিজের সম্পত্তি স্বেচ্ছায় পরের হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তবে একটা কথা জানা যায় যে আত্মহত্যা করিবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। এবং এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যায়, উন্মাদ অবস্থায় ফলাফল বিবেচনা না করিয়াই তিনি অতুল সম্পত্তিতে অপরের অধিকার দান করিয়া গিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীও বিষয় বুদ্ধিশালিনী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি উইলের মর্ম্মানুযায়ী সমস্ত সম্পত্তিতে কোম্পানির অধিকার ছাড়িয়া দেন। মহারাণীর সে সময়ের অবস্থার কোন বর্ণনা করা চলে না। রাজরাণী সহসা ভিখারিণী হইয়া গেলেন। কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য্য ও মনুষ্যত্ব সহকারে তিনি এই বিপদরাশি শিরে বহন করিয়া দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অসামান্য বুদ্ধিপ্রভাবে সুপ্রীম কোর্টে কোম্পানী বাহাদুরের নামে মোকর্দ্দমা করিয়া রাজা কৃষ্ণনাথের মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রমাণ করতঃ বিচারে সম্পত্তিতে পুনরায় স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি অত্যন্ত

সুকৌশলে সাংসারিক কার্য্য পরিচালনা করিয়া অচিরে ষ্টেটের ঋণ পরিশোধ করতঃ সংসারে সুশৃঙ্খলা আনয়ন করেন। সামান্য গৃহস্থের কন্যা কিরূপে এই বুদ্ধিচাতুর্য্যের অধিকারিণী হইয়া একটি বিশৃঙ্খল বিরাট রাজসংসারে সুখশান্তি ফিরাইয়া আনিলেন এবং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ হইতে সহসা অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আসিয়া স্বয়ং কি প্রকারে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবার গৌরব লাভ করিলেন তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্যসুখের বেষ্টনীর মধ্যে যাঁহারা লালিত পালিত হন রাজ্য-শৃঙ্খলা সম্পাদন করা তাঁহাদের পক্ষেও সকল সময় সম্ভব হয় না। মহারাণী ভবানী ও মহারাণী স্বর্ণময়ী কেহই রাজকন্যা নহেন কিন্তু উভয়েই ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীতা এবং উভয়েই দুস্থ জগতের কল্যাণের জন্য ধরাধামে প্রেরিত হইয়া তাঁহারই মহান উদ্দেশ্য সার্থক করিয়াছিলেন।

মহারাজার চরিত্র

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এই রাজবংশেরই উত্তরাধিকারী। মনে হয় এই কৃতী মহাপুরুষকে রাজবংশীয় গৌরব মণ্ডিত ইতিহাসে যোগ্য স্থান দিবার অভিপ্রায়েই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টির নিগূঢ়রহস্য বুঝা মানবশক্তির সাধ্যাতীত। বলা যায় না, ধরায় দীনদুঃখীর বেদনা মোচন,

অশিক্ষিত নির্য্যাতিত প্রজাকুলের শিক্ষা বিধান এবং তাহাদের কল্যাণ সাধন, দেশে সুশিক্ষার প্রচার প্রভৃতি অনেক মহৎ কার্য্যের জন্যই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সৃষ্ট হইয়াছিলেন কিনা! কিন্তু জগতে তিনি যে অনেক মহৎ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে তাঁহার অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য যে কেহ সম্পাদন করিতে পারেন নাই সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহও নাই।

পরগণা বাহারবন্ধ স্রোতের তৃণের মত ভাসিয়া আসিয়া রাজা কান্তচন্দ্রের অদৃষ্টে বাধিয়া গিয়াছিল। সেই বিরাট সম্পত্তি আবার তেমনি ভাবেই খড়কুটার মত দরিদ্র মণীন্দ্রচন্দ্রের দুয়ারে ভাসিয়া আসিয়াছিল। তিনি স্বপ্নাতীতরূপে 'মহারাজা' হইয়া স্বীয় জীবনে আপনার মহানুভব কার্য্যাবলী এবং অশেষবিধ সদ্‌গুণরাজি দ্বারা মহারাজার যোগ্য গৌরব লাভ করিয়াছেন এবং কি ধনী কি নির্ধন, কি সবল কি তুর্ব্বল, কি পুরুষ কি নারী, কি স্বদেশ কি বিদেশ, কি সাধারণ প্রজা-গণের নিকট, কি সার্ব্বভৌম রাজশক্তির নিকট সর্ব্বত্র সকল সময় সকল অবস্থায় তিনি সুবিমল যশঃ, অপ্রমেয় খ্যাতি এবং অতুলনীয় কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কি দয়া, কি দাক্ষিণ্য, কি ভক্তি কি ভালবাসা, কি বিদ্যা কি বুদ্ধি সকল বিষয়েই তিনি সমসাময়িক সকল জমিদারগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। স্বয়ং সুশিক্ষিত না হইলে সাধারণের শিক্ষার অভাব কাহারও উপলব্ধি করিবার সাধ্য হয় না, স্বয়ং তুঃখভোগ না

করিলে অপরের দুঃখ ও বেদনা বুঝিবার শক্তি কাহারও হয় না, স্বয়ং করুণার্দ্রচিত্ত না হইলে ভগবানের সুবিমল করুণালাভ করিবার যোগ্যতা কাহারও হয় না। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র স্বয়ং শিক্ষিত, দুঃখসহনশীল ও ভগবানে পরম ভক্তিমান ছিলেন তাই তিনি অপরের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে 'ধনানি জীবিতঞ্চৈব' পরার্থে উৎসর্গ করিয়া অমল আনন্দ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এত মহৎগুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই ভগবানে তাঁহার নিশ্চলা প্রীতি ও ভক্তি জন্মিয়াছিল এবং ভগবানের নামে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

অত্যাচার ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়াই মানুষের মহত্ব ও অতিলৌকিক ভাবরাশি বিকশিত হইয়া থাকে। দারিদ্র্যের অত্যাচার, অবস্থার নির্য্যাতন অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস এই সকলের মধ্য দিয়াই মহারাজ সাধারণের সান্নিধ্যে উপস্থাপিত হইয়াছিলেন এবং মনে হয় বোধ হয় শুধু এই কারণেই অতুল গৌরব, অজস্র লোকের ভক্তি, অসংখ্য হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার মধ্যে নিয়তির স্নেহহাস্যের কনক আলোতে তিনি বিলীন হইয়া গেলেন। তাঁহার তিরোধান সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং বজ্রাঘাতের ন্যায় মর্ম্মদাহী, বাংলদেশে এমন পল্লী নাই যে তাঁহার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ অমৃত বাজার পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যুর সংবাদগুলি অতি বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি

কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়াছি প্রতিদিন প্রায় তিন কলম স্থান তাহার মৃত্যুতে বিভিন্ন স্থানের শোকপ্রকাশক সংবাদগুলিতে পূর্ণ থাকিত। তাহাতেই দেখিয়াছি শুধু বাংলাদেশ নহে, ভারতের নানা প্রদেশের নানা প্রতিষ্ঠান হইতে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব (Condolence resolution) প্রকাশিত হইত। বাংলাদেশে অনেকের পক্ষে সাধারণের নিকট এরূপ শ্রদ্ধাভক্তি লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি অমর ধামে ভগবানের শ্রীচরণের সুশীতল ছায়াতলে বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি মহারাজা পরম শান্তিতে বিরাজ করুন।

এই প্রসঙ্গে কাশিমবাজার জমীদারীর একটু ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

কাশিমবাজার জমিদারীর উৎপত্তি
ও
সমসাময়িক ইতিহাস

নবাব মীর কাশিম যখন বাংলার মসনদে তখন শুল্ক লইয়া কোম্পানীর সহিত তাঁহার প্রবল মনান্তর ঘটে। এই মনান্তর ক্রমে যুদ্ধ বিগ্রহে পরিণত হইয়া সমগ্র বংলাদেশ জুড়িয়া এক বিরাট অশান্তির সূত্রপাত হয়। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে নবাব মীর কাশিম ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্যাপারটি মোটামুটী এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল।

দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণকে বাণিজ্য-বেসাতির উপর শুল্ক দিয়া ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হইত এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নবাবের এবং সম্রাটের সনন্দানুযায়ী সমস্ত বাংলা-দেশে অবাধ বাণিজ্য করিতে দেওয়া হইত। এই অবাধ বাণিজ্যের অধিকারের সুযোগ কোম্পানীর আমলা তন্ত্রও পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কোম্পানীর নিশান নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের নৌকায় উড়াইয়া দিয়া তাহারা অবাধে বিনাশুল্কে সমস্ত দেশে বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইয়া ব্যক্তিগত ভাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিতেছিল। এদিকে দেশীব্যবসায়ীরা শুল্ক দিয়া বাণিজ্য করিত। কোম্পানীর

আমলা দিগকে শুল্ক দিতে হইত না বলিয়া তাহারা যে মূল্যে জিনিষ পত্র বিক্রয় করিতে পারিত, দেশী বণিকেরা শুল্ক দিয়া সেই মূল্যে কেনা বেচা করিলে তাহাদের মূলধন হইতে ক্ষতি হইয়া যাইত। প্রতিযোগীতায় কোম্পানীর আমলাদের নিকট দেশী বণিকেরা যে শুধু ব্যবসায় ক্ষেত্রে পরাজিত হইত তাহাই নহে; পরন্তু তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ এত অধিক হইত যে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইত। ব্যাপারটি নবাবের চোখে ধরা পড়িয়া যায়।

নবাব মীরকাশিম মসনদ পাইবার আশায় শ্বশুর হইলেও নবাব মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হয় তাহাতে যোগদান করেন এবং নবাবকে বঞ্চিত করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই কলঙ্কটুকু ভিন্ন নবাব মীরকাশেমের অন্য কোন দোষ ছিল না। রাজ্য শাসক এবং প্রজাপালক হিসাবে তিনি অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং যথাসম্ভব ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। রাজ্য প্রাপ্তির পরেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বাংলার নবাব শুধু নামে, কাজের নবাবী করা অসম্ভব। আশে পাশে কোম্পানীর নানাপ্রকার আব্দার, ওজুহাত, আইন, সর্ত্ত ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া নবাবী করা অসম্ভব। বিশেষতঃ ঘরের পাশেই কোম্পানীর আফিস—স্বাধীন ভাবে কিছু করিতে গেলেই নানাপ্রকার বিবাদ বিসংবাদ বাধিয়া যায়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ

হইতে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিলেন এবং কোম্পানীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সুশিক্ষিত এবং উন্নত প্রণালীতে সৈন্য শিক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঠিক এই সময়ই শুল্ক বিভ্রাট ঘটে। মীরকাশিম সমস্ত ব্যাপার আদ্যন্ত চিন্তা করিয়া স্বয়ং প্রথমে কোন কঠোরতা অবলম্বন করিলেন না। তিনি কোম্পানীর হেড্ আফিসে এক আবেদন করিয়া আমলা গণের মধ্য হইতে এই হীনতা জনক নীতি উঠাইয়া দিবার জন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন। কোম্পানীর স্থানীয় ডিরেক্টরগণের এক সভার অধিবেশনে এই বিষয়ের আলোচনা কালে একমাত্র ওয়ারেন হেষ্টিংস ব্যতীত আর সকলেই মীরকাশিমের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আমলা গণের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে মত দেন। ফলে মীরকাশেমের আবেদন ব্যর্থ হইয়া যায় এবং তাহার কোন প্রতীকারই হয় না।

নবাব যখন এ কথা জানিতে পারিলেন তখন তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে বাংলাদেশে শুল্ক প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। কোম্পানীর আমলাগণ ঘটনার এরূপ পরিণতি আশা করিতে পারেন নাই। সহসা এই ঘটনা তাঁহা-দিগকে বজ্রাঘাতের ন্যায় বিমূঢ় করিয়া ফেলিল। তাহারা সমবেত হইয়া কত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিল। কোম্পানীর কলিকাতার ডিরেক্টরেরা মীরকাশিমের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলেন।

তারপর গোলাগুলি এবং অসি বর্ষার মুখে ইহার উত্তর

প্রত্যুত্তর হইতে লাগিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া নির্ব্বিরোধ ইংরেজবধের হুকুম দিলেন। নবাবী ফৌজ কুচ করিয়া ইংরেজ তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন অপরাহ্নে এক দরিদ্র দোকানদার দোকানের পশরা লইয়া বাজারে যাইতেছিল। দুর্গানাম স্মরণ করিয়া দোকানদার বাড়ীর বাহির হইয়া কেবল মাত্র রাস্তায় আসিয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই দেখিতে পাইল এক বিন্যস্ত বসন সাহেব সম্মুখের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিতেছে এব্রং মধ্যে মধ্যে এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছে। দোকানদার বুঝিল সাহেব কোম্পানীর লোক নবাবী ফৌজের তাড়া খাইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে।— তাহার মনে হইল হয়ত আশ্রয় দিয়া লুকাইয়া রাখিতে পারিলে ইহার প্রাণরক্ষা করা যায়। দোকানদার অগ্রসর হইয়া সাহেবের প্রতিক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিল।

এই সাহেব ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং এই দোকানদার কাশিম বাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভাগ্যবান কান্তবাবু।

ওয়ারেন হেষ্টিংস হাঁপাইতে হাঁপাইতে কান্তবাবুর সম্মুখে আসিয়া একটু আশ্রয়ের নিমিত্ত কাতর কণ্ঠে আধা ইংরেজী আধা বাংলা এবং হিন্দি মিশ্রিত অপূর্ব্ব ভাষায় তাহার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশ্য এত কাতরতা প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিলনা কারন পরদুঃখ কাতর কান্তবাবুর প্রাণ পূর্ব্ব হইতেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রতি করুণার্দ্র হইয়াছিল।

সাহেব স্বীয় দুঃখ ব্যক্ত করিতেই কান্তবাবু তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া পুনরায় নিজের গৃহের দিকে চলিলেন। সেদিন আর বাজার করা হইল না।

গৃহে ফিরিয়া কান্তবাবু স্বীয় পত্নীকে সমস্ত ব্যাপার অতি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া ওয়ারেন হেষ্টীংসকে নিজের একখানি মাত্র জীর্ণ ঘরে একখানি ভগ্ন তক্তপোষের নীচে লুকাইয়া রাখিলেন এবং নিজে বাহিরে আসিয়া নবাবী ফৌজের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সশস্ত্র উন্মত্ত নবাবী ফৌজ কোলাহল করিতে করিতে সেই পথে আসিতেছে। কান্তবাবু শঙ্কিতহৃদয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নবাবী ফৌজ অগ্রসর হইতে হইতে পথে কান্তবাবুকে দেখিয়া কোন সাহেব সেই পথে গিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। কান্তবাবু অকুণ্ঠিত চিত্তে কুটীল পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ঐ পথে একজন সাহেব দৌড়াইয়া পালাইয়া গিয়াছে।' ফৌজ কোলাহল করিতে করিতে সেইপথ দিয়া চলিয়া গেল।

ঘরে ফিরিয়া কান্তবাবু দেখিলেন, ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে সাহেব অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া অবসন্নভাবে পড়িয়া আছে। কান্তবাবুর ঘরে তখন কোন খাদ্য সামগ্রী ছিল না। কেবলমাত্র আমানির গর্ত্তে দুটিমাত্র আমানি (পান্তাভাত) ছিল। নিরুপায় হইয়া কান্তবাবু হেষ্ট্রীংস্‌কে ঐ আমানি খাওয়াইলেন এবং প্রচুর পরিমাণে আমানির জল পান করাইলেন। তিন

দিনের অনাহার ও পরিশ্রমে নিরতিশয় কাতর ওয়ারেন হেষ্টীংস আমানির জল ও আমানি ভোজন করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। সে রাত্রি হেষ্টীংস কান্তবাবুর পর্ণকুটীরে অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রত্যুষে কলিকাতা রওনা হইলেন। যাইবার সময় নিজের হস্তের অঙ্গুরী খুলিয়া কান্তবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"আমি কোম্পানির কর্ম্মচারী, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। আমার নাম ওয়ারেন হেষ্টীংস—যদি কখনও আমার সুদিন হয় তবে কলিকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করিও। জীবন রক্ষার ঋণ যদি কিছু পারি পরিশোধ করিব।"

ওয়ারেন হেষ্টীংস স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। গোলযোগ থামিয়া গেলে কিছুদিন পরে ওয়ারেন হেষ্টীংস কোম্পানীর গভর্ণর জেনেরল হইলেন। এই সময় পাড়া প্রতিবেশীর নিতান্ত আগ্রহাতিশয্যে কান্তবাবু কলিকাতায় গিয়া ওয়ারেন হেষ্টীংসের দরবারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ওয়ারেন হেষ্টীংস জীবনদাতাকে ভুলিতে পারেন নাই। কান্তবাবুকে দেখিবামাত্র তিনি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তিনি কি চান তাহা জিজ্ঞাসা করেন। কান্তবাবুর প্রতিবেশীরা তাঁহাকে বিপুল অর্থ ও রাজত্ব প্রার্থনা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু নির্লোভ কান্তবাবু কোনরূপে তাঁহার জীবিকা সংস্থানের একটি উপায় করিয়া দিবার জন্য হেষ্টীংসকে অনুরোধ করেন।

জীবনের বিনিময়ে কি দিলে জীবনরক্ষকের মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় হেষ্টীংস তাহাই ভাবিতেছিলেন। কান্তবাবুর কথা শেষ হইলে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া হেষ্টীংস বলিলেন, "বাহারবন্দ পরগনার জমীদারী এখনও বিলি হয় নাই, আমি এই জমীদারী কৃতজ্ঞতার দান স্বরূপ তোমাকে দিলাম।"

রাজা হইয়া কান্তবাবু গ্রামে ফিরিলেন। এই হইতেই কাশিমবাজার রাজবংশের সূত্রপাত হইল।

কাশিমবাজার জমিদারীর ইতিহাস সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে তাহাই উপরে লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত ইতিহাস নিম্নে লিখিত হইল।

যখন বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যায় সিরাজদৌল্লা নবাব নাজিম ছিলেন তখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের অধ্যক্ষতায় কাশিমবাজারে ইংরাজদের এক রেশম কুঠি ছিল। সিরাজদৌল্লা এই কুঠি আক্রমণ করার হুকুম দেওয়ায় ওয়ারেন হেষ্টিংস পলায়ন করেন ও ব্যবসায়ী ৺কৃষ্ণকান্ত নন্দীর শরণাপন্ন হন। এই কৃষ্ণকান্তই পরে কান্ত বাবু নামে পরিচিত। কান্ত বাবু তাহাকে নিজ নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। হেষ্টিংস এই উপকার বিস্মৃত না হইয়া বাংলার গভর্ণর হওয়ার পরে এই কান্তবাবুকে নিজ দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কান্তবাবু নিজ বুদ্ধিবলে বহু ভুসম্পত্তির মালিক হন ও পরে হেষ্টিংসকে চেৎসিংহের বিরুদ্ধে অভিযানে বহু সাহায্য করায় হেষ্টিংস কর্ত্তৃক গাজিপুরে এক জায়গীর প্রাপ্ত হন। এই সময়ে কান্তবাবু চৈৎসিংহের লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ও সেই মন্দির (পাথরের কক্ষ) প্রাপ্ত হন। ইহা খুলিয়া কাশিমবাজার বাটীতে পুনর্গঠিত হয়।

মহারাজার
উচ্চ মনোবৃত্তি

কাশিমবাজারের ন্যায় এরূপ বিস্তৃত জমিদারী বাংলাদেশের অন্য কোন জমীদারের নাই। ইহার বর্ত্তমান বার্ষিক আয় আনুমানিক আঠার লক্ষ টাকা। ব্যয়ের পরিমাণ করা যায় না, সম্পত্তির আয় অনুযায়ী ব্যয় করিলে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র স্বকীয় সম্পত্তির আয় চতুগু'ণ বৃদ্ধি করিতে পারিতেন কিন্তু ইহজীবনে তিনি আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে পারেন নাই। দরিদ্রের দুঃখের কাছে সম্পত্তির আয়ের মূল্য অতি তুচ্ছ—তিনি তাঁহার প্রভূত ধন দরিদ্রের জন্য নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিলেন—তাঁহার মনে ছিল শুধু পরদুঃখ কাতরতা এবং চক্ষের সম্মুখে ছিল দরিদ্র, আর্ত্ত, অসহায় অশিক্ষিত। আর কিছু তাঁহার দেখিবার ছিল না, আর কিছু তাঁহার চিন্তা করিবারও ছিল না। যে বিরাট সম্পত্তি পরোপকার ও নিরাশ্রয়ের জীবন রক্ষারূপ মহৎকার্য্যের পুরস্কার, যে বংশ বিপন্নকে উদ্ধার করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই সম্পত্তি ও সেই বংশের উত্তরাধিকারী যে পরের জন্যই, একথা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার কোন, প্রয়োজন নাই। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র যে বংশের উত্তরাধীকার লাভ করিয়াছিলেন নিজের অত্যুচ্চ মনোরম মনোবৃত্তি দ্বারা সেইবংশের সকলকেই ম্লান করিয়া স্বীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন। ত্যাগের মহিমা—এইরূপ সুন্দর ত্যাগের গৌরব এতই উজ্জ্বল।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের শুধু দানের কথা লিখিলেই এতদপেক্ষা একখানি বৃহত্তর গ্রন্থ সম্পাদিত হইতে পারে। জমীদারী বা ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিলে, সাধারণতঃ দেখা যায় লোকে প্রথমে আপনার এবং তৎপর নিজ পরিপারের সুখ সন্তোষ বৃদ্ধির বিধান করে। তখন বাহিরের জগতের কথা লোকের স্মরণ হয় না অথবা হইলেও বাহিরের কথা অন্তরকে তেমন আঘাত দিয়া কাঁদাইতে বা টলাইতে পারে না। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। মহারাজা মাতুল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রথম যে দিন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন তখনই দেখিলেন, নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অপেক্ষা সমষ্টিগত ভাবে সমাজের অর্থের অনেক বেশী প্রয়োজন। এই চিন্তাধারা হইতেই তাঁহার দানশীলতার জন্ম হয়।

কর্ম্মজীবনের বৈচিত্র্য।

তাহার চরিত্র প্রসঙ্গে কোন মাসিকপত্র লিখিয়াছেন "সুদীর্ঘ কর্ম্ম-জীবন যাপন করিয়া বৃদ্ধ-বয়সেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু আমাদের নিকট নিতান্ত অকাল-মৃত্যু বলিয়াই মনে হইতেছে। 'অকাল' বলিতেছি এই জন্য—ভারতীয় সাধনার নামে যে প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি এই সর্ব্বশেষ নিজেকে সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা অতি শৈশব

অবস্থাতে; আর যে ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম-রূপিণী মাতৃকার পবিত্র ক্রোড়ে আজীবন শিশুর মত সরল ও স্বচ্ছন্দ মনে কর্ম্ম-ক্রীড়ায় রত ছিলেন, অদম্য উৎসাহে কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া নিজ শতোন্মুখীন কর্ম্ম ও ধর্ম্মজীবনকে সমভাবে চালাইয়া গিয়াছেন, বার্দ্ধক্যের ছায়া তাঁহার জীবনে কখনও পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় নাই। এই অল্প কয়দিন পূর্ব্বে তিনি পরিষদের কার্য্যে যে উৎসাহ দেখাইয়া গিয়াছেন, কোনও যুবক সভ্যতে তাহা অপেক্ষা অধিক দেখা যায় নাই; বোধ হয় সকল অনুষ্ঠানেই তিনি ঐরূপ ছিলেন।

"সংবাদপত্রে মহারাজের অশেষ গুণাবলী বিশেষতঃ তাঁহার দানশীলতা সম্বন্ধে অনেক কথার উল্লেখ হইতেছে; তাহার কোনটীরই অতিরঞ্জন হইতে পারে না—তিনি বাঙ্গলার জমিদারকুলের অগ্রণী ছিলেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির সকল কার্য্যে উন্মুখ, অনেক্গুলি প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক ছিলেন, সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে দণ্ডায়মান হইতেন—বিগত—১৯০৫ অব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম প্রতিবাদ সভায় তিনিই অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। শিক্ষা ও ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অসাধারণ ছিল। তাঁহার অতুলনীয় দান প্রধানতঃ এই দুই কার্য্যেই প্রযুক্ত হইয়াছিল—কত গ্রন্থকার ও বিদ্বান তাঁহার দ্বারা প্রতি-পোষিত হইয়াছেন, কত বিবিধ প্রকারের বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান তাহার ব্যয়ে সংস্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে!

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্, জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, বাণিজ্য বিদ্যালয়, খনিজ বিদ্যালয়, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, কর্ম্মশালা, শিল্প বিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রভৃতি নূতন নূতন নামীয় বিবিধ বিদ্যালয় মহারাজা বাহাদুরের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-স্থাপিত বহরমপুর কলেজ ও জমিদারীর অন্তর্গত অনেকানেক বিদ্যালয় তিনি পরিপোষণ করিতেন। এক শিক্ষাকার্য্যেই তিনি কোটীর অধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম-কার্য্যে দান, দুস্থ লোকদিগের সাহায্য তাঁহার অসীম ছিল।

ধর্ম্ম সাধনা ও বাস্তবজীবনের আদর্শ।

"কিন্তু কেবল মাত্র দানের দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের মহত্ব বুঝিতে হইবে এমন নহে—যে ধর্ম্ম ও সাধনার বলে লোকে দানাদি মহৎ কার্য্যে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা তাঁহার জীবনে কতখানি অধিগত হইয়া বাস্তব জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপে প্রতিফলিত হইত তাহাই বিশেষরূপে লক্ষণীয়। ভারতীয় সাধনার নামে যে অনুষ্ঠানে তিনি কতকদিন প্রধান ব্রতী হইয়াছিলেন, উহার প্রকৃতির অনুসন্ধানে যে সকল মহৎ লক্ষণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান প্রধান অনেকগুলি গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ এই রাজর্ষি চরিত্রে দেখা গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। মহারাজের পরার্থে-আত্মদান বিষয়ে অধিক কিছু উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। নিষ্কাম কর্ম্মের দৃষ্টান্ত তিনি পদে পদে দেখাইয়া গিয়াছেন—

তাঁহার অনেক দানের কার্য্যে সফলতা দেখা যায় নাই, অনেক লোককে তিনি বিনা বিচারে দান করিয়াছেন, এবং অত্যধিক অবিচারিত দান করিয়া পরিশেষে তিনি নিজে নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া অনেকের মুখে আক্ষেপ শুনা যায়; কিন্তু তিনি নিজে কখনও সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। একদিন অল্প কথায় এবিষয়ে তিনি তাঁহার নিজ আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়—কোন প্রসঙ্গে পরিষদের কার্য্যের কাঠিন্যের কথা উঠিলে বলিলেন—'দেখুন, আগে কর্ম্মী, তার পরে অর্থ ও তৎপর কর্ম্ম; কিন্তু কর্ম্ম হইলেই যে ফল হইবে তাহা নহে'। ভারতীয় সাধনার আর একটা বিশেষ লক্ষণ—সর্ব্বভূতে সমদর্শন; আমরা ভারতের ধর্ম্ম সাধনারই সাধারণতঃ বড়াই করিয়া থাকি; কিন্তু প্রায় সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যে এই ধর্ম্ম সাধনার অল্পাধিক বিকাশ হইয়াছে; জ্ঞান ও কর্ম্ম সাধনায় পৃথিবীর অনেক দেশ অনেক সময় উন্নতি দেখাইয়া গিয়াছে; কিন্তু যে অধ্যাত্মদৃষ্টি-বলে সকল বস্তুতে সমান জ্ঞান—সকলই এক পরম ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অনুভূত হইয়াছে, তাহা এক ভারতেরই নিজস্ব। স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এই তত্ত্বটী কিরূপ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, তাহা তাঁর একদিনের একটী ছোট্ট কথাতে প্রকাশ পায়—বৃন্দাবনে বানর বিতারণ লইয়া এক আন্দোলন সম্প্রতি হইয়াছিল, কলিকাতা এলবার্ট হলে ইহার এক প্রতিবাদ সভা হয়; মহারাজকে ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহ্বান করা

হয়; সেই সময়ে ভারতীয় সাধনা মূলক শিক্ষাপরিষদের উপসমিতির অধিবেশন সকল মহারাজের বাড়ীতে হইতেছিল; আমরা সেজন্য উপস্থিত ছিলাম। সভার কথা উঠিতে তিনি বলিলেন—'আমাদের ধর্ম্ম এমন যে, বানর, কুকুর, বিড়াল, পশু, পক্ষী সকল লইয়া আমরা একত্র বাস করিব; তীর্থ ক্ষেত্রগুলি সে আদর্শ দেখাইবার স্থান। সেখানে জীবহিংসা করিতে নাই'।

"মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনচরিত্র পর্য্যাপ্ত আলোচনা করিবার স্থান এ নহে। জীবনের শেষ কয়টি দিনে তিনি ভারতীয় সাধনার নামে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহাকে জানিবার আমাদের যে সৌভাগ্য ও সুযোগ ঘটিয়াছিল, সেই সম্বন্ধেই কিছু এখানে বিবৃত করিব। ব্যক্তিগত কিছু প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় সাধনার পবিত্র নামে যে প্রচেষ্টা তাহাতে ব্যক্তিত্বের কোনও স্থান নাই। মহারাজকে যে আমরা ঐ সাধনার একটী জীবন্ত প্রতীকরূপে পাইয়াছিলাম, তাহা বলাই এখানে উদ্দেশ্য।

সাধনা ও জীবন সংস্কারে মহারাজা

"ভারতীয় সাধনার আন্তরিক প্রকৃতি অবলম্বনে দেশ ও সমাজের প্রতি ক্রিয়াত্মক ভাবে কিছু কর্ত্তব্য বা সেবা আছে কি না, প্রবাসের কোনও নিভৃত ভূমি হইতে যখন এভাব লইয়া আসিয়াছিলাম, অল্পসংখ্যক হইলেও, তখন হইতে

বাঙ্গালার কয়েকজন সিদ্ধ কল্প মহাপুরুশের দর্শন ও উৎসাহ লাভের অবসর হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গলা ভারতীয় সাধনার শেষ পরিণতি ভূমি—ন্যায় বেদান্তের জ্ঞানগরিমা এখানেই শেষ বিকাশ লাভ করিয়াছে, চৈতন্য রামকৃষ্ণের আবির্ভাব এ যুগে এইখানেই হইয়াছে, বিবেকানন্দের বজ্রবাণী এখানে নির্ঘোষিত হইয়াছে, রবীন্দ্র-অরবিন্দ-জগদীশের শেষ সাধনা এখনও চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন সাধনায় রত রহিয়াছেন। অন্যত্র তাহা দুর্ল্লভ। ভরসা হয় ইহাদের সমন্বয়ে অদ্ভুত ফল উৎপন্ন হইবে। হাবড়ার প্রাচীন উকীল শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দত্ত মহাশয় গুরুকুল-শিক্ষা প্রণালীর বিষয় জানিবার জন্য আমাদের সহিত সাক্ষাত করিতে চাহেন, তাহাতে আমরা যাইয়া তাঁহার বাড়ীতে সাক্ষাৎ করি। তখন যে সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা হয়, তাহাতে তিনি বলেন, 'চলুন আপনাকে লইয়া মহারাজের নিকট যাই, তিনি ইহাতে অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিবেন।' আমরা বলিলাম—'মহারাজের নিকট লোকে অর্থ আকাঙ্ক্ষা করিয়াই যায়, ইহা মনে হয়; কোন কার্য্য উপলক্ষে যদি যাওয়া যায়, তবেই যাইব; কিন্তু তেমন কার্য্যত আমাদের কিছু হয় নাই।' মহারাজের দর্শন লাভ এযাবত মাত্র একদিন আমাদের হইয়াছিল—১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের কলিকাতা টাউন হলের সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মহা সভায় সভপতির আসনে। তৎপর তাঁর বিশেষ দানের কথা সর্ব্বদা শুনিতাম। এক্ষণে সর্ব্বস্ব

দান করিয়া নিজ সম্পত্তি পরের হাতে দিয়া বসিয়াছিলেন, তাহাও জানিয়াছিলাম।

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়।

"প্রায় তিনমাস পরে গত বৎসর আশ্বিন মাসে যখন রাঁচি ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদিগের সম্মিলনসভা হয়, তখন মহারাজের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ দর্শন আমাদিগের ঘটে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ কলিকাতা আর্য্যসমাজমন্দিরে আসিয়া ছিলেন; আচার্য্য সত্যানন্দজী আমাকে অন্য একটী কাজে সন্ধ্যার সময় তথায় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। আমরা গিয়া দেখি এক সভার আয়োজন; মহারাজা সভাপতি, মহারাজকুমার শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র, রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ও প্রাচীন-নূতন অনেক ছাত্র উপস্থিত আছেন। দূরে বসিয়া ইহাদের অনেকের বক্তৃতা শুনিতেছিলাম; মহারাজকুমার ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতি (culture) ও তন্মূলে শিক্ষার বিষয়ে তখন যে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতে বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার শিক্ষা ও পারিবারিক সংস্কারের উপর শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার পর স্বামী সত্যানন্দজীর অনুরোধক্রমে আমাদিগকে কিছু বলিতে হয়—মনে হয়, গুরুকুল শিক্ষাপ্রণালী ও ভারতীয় সাধনার ভাবে এদেশে শিক্ষাকে ব্যাপক ভাবে সঞ্জীবিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু

বলিয়া থাকিব। তখন মহারাজার মহাপ্রাণতা ও সরল হৃদয়াগ্রহের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আমাদিগের উপস্থিত এই কর্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিবার সূত্রপাত করিয়াছে—তিনি সভাপতির আসন হইতে ঝুঁকিয়া আসিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ এবং শীঘ্র যাহাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, সাগ্রহে অনুরোধ করিলেন। তৎপর সভাপতির এক সুদীর্ঘ অভিভাষণে তিনি যত কথা বলিলেন—তাহাতে ভারতীয় সাধনার যে যে ভাব আমাদিগের অন্তরে জাগিতেছিল, তাহার সমস্ত গুলিতে এক অপূর্ব্ব রসসঞ্চার বোধ করিলাম; পরিশেষে তিনি এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, যে যদি এইরূপ কোনও কাজে বাঙ্গলাতে থাকিয়া যাই, তবে ভাল হয়। তখন এই কথার মর্ম্ম ভালরূপে ধরিতে পারি নাই। ঐ দিন সভার পরে মহারাজ অসুস্থ হন, পরদিন দেখা করিবার কথা ছিল; অসুস্থ অবস্থায় দেখা হইবে না বলিয়া তিনি নিজে লোক পাঠাইয়া সে সংবাদ দেন। পূজার পূর্ব্বে তখন কতকদিনের জন্য আমাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। প্রস্তাবিত সাক্ষাৎকারলাভ হয় প্রায় তিন মাস পরে। ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত ও রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের আচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গিরি প্রভৃতি মহাশয়গণের সহযোগে ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষা পরিষদের সংগঠনের উদ্যোগ হইতে থাকে।

"প্রথম সূত্রপাত হইতেই ইহা স্থিরীকৃত হয় যে স্যর মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে

সমিতির কার্য্য পরিচালিত হইবে। তদবধি সমিতির কার্য্যক্রম আজ আট মাস যাবত কি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, ভারতের সাধনার পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। সমিতি যে ভাবে মহারাজ বাহাদুরকে আপন সভাপতি পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা গত প্রারম্ভিক সাধারণ সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের কথায় ব্যক্ত হইয়াছিল; তিনি বলেন,—'মহারাজা বাহাদুর কেবল যে ধনবল ও উচ্চপদবী গুণেই এই সভার অধিনায়কত্ব করিবার উপযুক্ত তাহা নহে, পরন্তু দেশের সকল প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠানের অগ্রণী, মহাপ্রাণ এবং বর্ত্তমান সময়ে এদেশে ব্রহ্মচর্য্যমূলক জাতীয় শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়াই তিনি এই পদ অধিকার করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য।'

"তদবধি মহারাজ বাহাদুর পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও উপসমিতির সভাপতির কার্য্যও করিয়া আসিয়াছেন। কখন কখন কেবলমাত্র এই সকল সভার কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত কাশীমবাজার হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সমিতির প্রাপ্ত অভিমত সমূহ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিজ সঙ্গে কাশীমবাজার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। উপসমিতির অধিবেশন কালে ক্রমান্বয়ে বহু দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। অতি গুরুতর বিষয়ে সমিতির কয়েকটী সিদ্ধান্ত বিশেষ করিয়া

মহারাজা বাহাদুরের প্রস্তাবানুসারেই গৃহীত হইয়াছে; যেমন (১) শিক্ষায় অর্থকরী ও কার্য্যকরী বিষয়ের বিশেষ স্থান থাকা চাই। (২) ভারতীয় সাধনা ও প্রস্তাবিত শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে দেশবাসীগণের যে সকল অভিমত পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেশ মধ্যে বিস্তৃতরূপে প্রচার করিতে হইবে। আর এই প্রচারকার্য্য উপলক্ষ করিয়াই 'ভারতের সাধনার' উৎপত্তি হইয়াছে।

জাতীয় সাধনায় মহারাজা

"আজ ভারতীয় সাধনার নামে লোকে প্রত্যয় হারাইয়াছে; দেশের শিক্ষা দীক্ষা সকলই উহার প্রতিকূল। ভিতর ও বাহির হইতে নানাপ্রকার আঘাত ও আক্রমণ উহার উপর হইয়া আসিতেছে; এ সময় ইহার সমর্থনে কিছু করিতে যাওয়া যে কতখানি কঠিন তাহা সকলেই বুঝিয়া থাকেন, পদে পদে নৈরাশ্য আসিয়া ঘেরিতে চাহে; উৎসাহ খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজা বাহাদুর জীবন-ব্যাপী বহু সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন—এ কালে এদেশে খুব কম সৎকার্য্য হইয়াছে, যাহাতে তাঁহার আন্তরিক সহযোগ ও অজস্র দান না হইয়াছে। তাহার পরিণাম দেখিয়া তিনি একালে কতকটা নৈরাশ্য প্রকাশ না করিতেন এমন নয়; বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান সময় যে নবীন আন্দোলন সকল চলিতেছে, তাহার ব্যভিচার দেখিয়া সময় সময় ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু জাতীয় সাধনা-

মূলক উপস্থিত এই উদ্যোগে মহারাজ বাহাদুর সর্ব্বদাই আশা ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন ; এইরূপ অনেক দিনের কথা মনে পড়ে—একদিন ইহার ভবিষ্যত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কথা উঠিলে, আমরা কোন নৈরাশ্যজনক ভাব প্রকাশ করিলাম ; জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গী ছিলেন। তখন মহারাজ বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন—'আমি এযাবত যাহা দেখেছি, শুনেছি, ও বুঝেছি, তাহাতে এই ধারণায় এসেছি যে এই হচ্ছে বাস্তবিক কার্য্য করিবার পথ ; আপনারা হতাশ হইবেন না'।

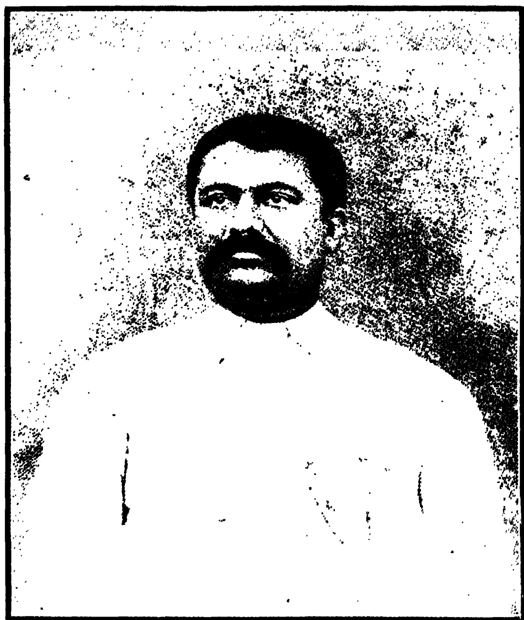
শিক্ষায় মণীন্দ্রচন্দ্র

শিক্ষায় আন্তরিকতা

আধুনিক কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বিধি মানিয়া চলিতে হয়। ব্যক্তিগত অর্থ বা সাধারণের মধ্য হইতে উদ্বৃত্ত বেসরকারী অর্থদ্বারা কোনপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিতে হইলেও তথাকার শিক্ষা প্রণালীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারা মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু স্বর্গীয় মহারাজার জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত রীতি ভিন্নও বহু প্রতিষ্ঠান নিজের আদর্শ অনুযায়ী স্থাপন করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি এখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু পূর্ণতা লাভ না করিলেও তাহার মূল উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছে বলিয়াই সকলের বিশ্বাস।

শিক্ষায় দান

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত অসংখ্য বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রচুর অর্থ সাহায্য দেখিয়া মনে হয় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে



যৌবনে 'মণীন্দ্রবাবু'

অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অত্যন্ত আস্থাবান এবং সাহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। বহরমপুরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের জন্য তাঁহার অকুণ্ঠিত অর্থব্যয় দেখিয়াই এই ধারণা সুদৃঢ় হয়। তাঁহার মাতুলের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয় বিষয় শিক্ষারই প্রকৃষ্টতম উপায় নির্দ্ধারিত আছে। ইহা ছাড়াও এই কলেজটি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক সাজসজ্জায় সুসজ্জিত। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের কথা এই যে এই কলেজে বাণিজ্য (commerce) শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত আছে।

জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে দান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন হইলেও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বকল্পে দান করিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (National Council of Education) এতদ্দেশীয় যুবক বৃন্দের মধ্যে নির্ব্বিশেষে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকতম সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধীয় উচ্চ শিক্ষা প্রচারের জন্য দেশীয় লোকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইহার স্থানে পরবর্ত্তীকালে স্বর্গীয় মহারাজা ও স্বর্গীয় স্যর রাসবিহারীর দানশীলতায় Bengal

Technical Institute প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার নাম "College of Engineering and Technology" এবং এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা।

ভারতীয় সাধনা ও জীবনাদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে মহারাজা প্রতিষ্ঠিত রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছি। মহারাজা যে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা প্রণালীর উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন, রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় তাহার নিদর্শন।

শিল্প শিক্ষা প্রসারে।

শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসঙ্গে যাদবপুর কলেজের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাদবপুর কলেজ ভিন্নও তিনি এইজন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন।—কাপ্টেন পিটাভেলের (Captain Petavel) সহকারিতায় তিনি কলিকাতায় পলিটেকনিক ইনষ্টিট্যুট (Politechnique Institute) নামক একটি অভিনব প্রণালীর সর্ব্বাঙ্গ স্নুন্দর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া উচ্চাঙ্গের হস্ত ও কুটীর শিল্প শিক্ষা দান দ্বারা এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের সাংসারিক জীবনে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার একটা পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্বর্গীয় মহারাজা

জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই প্রণালীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে যে কত গভীর তাহা সকলেই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন এবং শুধু বাংলা দেশে নহে ভারতের নানা বিভিন্ন স্থানে এই প্রকারের ঠিক একই আদর্শে বর্ত্তমানে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতির অন্ন-সমস্যা দূরীকরণের প্রয়াস পাইতেছে।

পরবর্ত্তী কালে যখন রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের পাশ্চাত্য দেশে নানাপ্রকার শিক্ষা সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসার সমিতির (Association for the advancement of Science) প্রতিষ্ঠা করেন তখন স্বর্গীয় মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্যে তাহার কোন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ইহারই কল্যাণে আমাদের দেশের বহু যুবক পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া নানাপ্রকারের বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ বিশেষ উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

প্রাচীন চিকিৎসা ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায়।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য একটি আয়ুর্ব্বেদ বিভাগ খোলা হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় চিকিৎসা ও প্রাচীন

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দানের কোন ব্যবস্থাই নাই। খ্যাতনামা দেশীয় কবিরাজগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ গৃহে রাখিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষণেচ্ছু যুবকগণকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন বটে কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে পর্য্যাপ্তও হইত না এবং সকলের সকল উদ্দেশ্যও তাহাতে সাধিত হইত না। এই অভাব দূর করিবার জন্য স্বর্গীয় মহারাজা এবং স্বর্গীয় যামিনীভূষণ রায় প্রভৃতি যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাহারই সুফল আজ সমগ্র বঙ্গবাসী ভোগ করিতেছেন, আজ তাঁহাদেরই মহান প্রচেষ্টার ফলে কলিকাতায় মহারাজের পরম পূজনীয়া মাতৃদেবীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দসুন্দরী অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাগার স্থাপিত হইয়া দেশীয় লোকের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে।—এই সকল বিদ্যালয়েই গ্রন্থ অধ্যয়ন ব্যতীত প্রত্যক্ষ হস্তকার্য্যাদিও (Practical) শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। "মহারাজা কাশিমবাজার গোবিন্দসুন্দরী অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদ কলেজ" মহারাজার পৈতৃক ভবন ২০ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত। এই কলেজে বিপন্ন রোগিগণের থাকিবার স্থান (in-door) ও সুবন্দোবস্ত আছে। এতদ্ব্যতীত সমাগত সকল রোগীকেই যত্ন সহকারে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা করা ও ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক কাব্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ের উপর এই কলেজের অধ্যক্ষতা-ভার অর্পণ করা আছে।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রসারের ব্যয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় মোটামুটী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য তত্তৎ বিদ্যালয়গুলির কল্যাণ কামনায়ও মহারাজা বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন। কলিকাতার প্রায় সকল পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষাগার গুলিতেই তিনি বহু পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য এই সমস্ত কলেজ ও স্কুলগুলি তাঁহার বদান্যতা ও দানশীলতার নিকট ঋণী।

বঙ্গ সাহিত্যে মহারাজা

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র যে শুধু শিক্ষারই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহা নহে। সাহিত্যের প্রসার কল্পেও তাঁহার আত্মত্যাগ অনন্যসাধারণ। তাঁহার দানে পুষ্ট হইয়া আজ সাহিত্য পরিষদ সগর্ব্বে তাঁহার জয় ঘোষনা করিতেছে। বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির মূলে যে যে সাহিত্যসেবীগণের মধুময় স্মৃতি বিজড়িত আছে তাঁহাদের মধ্যে দুই মহাত্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন স্বর্গীয় নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ রায় এবং অন্যজন আর্ত্তসেবী দীনদরিদ্রের পরিত্রাতা স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ স্বয়ং কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র স্বয়ং সাহিত্যিক বা কবি না হইলেও তিনিও একদিক দিয়া সাহিত্যের প্রাণসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের মর্য্যাদা তিনি বুঝিতেন এবং তাঁহার ধারণা ছিল যে দেশের সাহিত্যকে উন্নত ও নিরাপদ করিতে না পারিলে এবং

বিভিন্ন সাহিত্যিকগণের একটী সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরস্পরের মিলন ও অন্তরের বিনিময় করাইতে না পারিলে সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষতঃ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সাহিত্য পরিষৎ গঠিত হইয়া সুচিন্তিত গবেষণা ও সুচারু মন্ত্রণা দ্বারা সাহিত্যের গঠন করিতে না পারিলে সাহিত্য গঠন সম্পূর্ণ হইবে না। পক্ষান্তরে সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভৃতি ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকিলে সাহিত্যের ভাণ্ডার শূন্য রহিয়া যাইবে। এইজন্যই তিনি সাহিত্যসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য পরিষদের গৃহনির্ম্মাণের জন্য ভূমিদান এবং সাহিত্যের যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন সাহিত্য পরিষদ ও "রমেশ ভবন" থাকিবে এবং ততদিন মহারাজের নাম স্বর্ণাক্ষরে সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত থাকিবে। সাহিত্যিকগণের মনের মন্দিরে তিনি সোনার আসনে বিরাজ করিতেছেন এবং এমনি ভাবে যুগে যুগে বাঙ্গালীর সাহিত্যসাধনায় তাঁহার পুণ্যস্মৃতি অমর হইয়া বিরাজ করিবে।

সাহিত্য পরিষদে শোকসভা

তাঁহার পরলোক গমনের পর সাহিত্য পরিষৎ ভবনে তাঁহায় মৃত্যুতে শোকপ্রকাশার্থ একটি সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, কুমার শরৎকুমার রায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মন্মথমোহন বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রফুল্লকুমার সরকার, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ সোম, অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র অদ্বিতীয় দানবীর ও দেশের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যের একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অকৃত্রিম বান্ধব ছিলেন। শিশু-পরিষদকে তিনিই আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহারই প্রদত্ত জমির উপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির ও

রমেশ ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজার ন্যায় সরল, অমায়িক, বিনম্র ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক এযুগে বিরল।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির গৃহীত একটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলেন, সাহিত্য পরিষদের শৈশবে, তাহার সঙ্কটকালে মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। মহারাজা যে কতভাবে কত দিক দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও বাঙ্গলা সাহিত্যের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। যতদিন সাহিত্য পরিষদ থাকিবে, ততদিন তাহাই মহারাজার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ হইয়া রহিবে। মহারাজা পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও তিনি এখন বৈকুণ্ঠে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবু বলেন, তাঁহার বিশ্বাস, সেখান হইতেও মহারাজা সাহিত্য পরিষদকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

অধ্যাপক খগেন্দ্র মিত্র

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন যে মহারাজা বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে অন্তরের সঙ্গে ভাল বাসিতেন, সর্ব্বদা তাহার কল্যাণ চিন্তা করিতেন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই অকাতরে দান করিতেন। ইহাতে সময় সময় তাঁহাকে প্রতারিত হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু সেজন্য তিনি নিরুৎসাহ

হন নাই। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন লোক এযুগে বড় দেখা যায় না।

কুমার শরৎকুমার

কুমার শরৎকুমার রায় মহারাজার ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যের বর্ণনা করেন।

অন্যান্য কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা করিবার পর শোক-সূচক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, প্যারীমোহন সেন গুপ্ত ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মহারাজার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কবিতা পাঠ করেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দানের পরিমাণ

সাধারণ শিক্ষা প্রচারের জন্য মহারাজার অর্থানুকূল্য দেখিয়াই মহারাজের বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু শিক্ষা বিস্তারের জন্যই তিনি জীবনে এক কোটীরও অধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে শিক্ষা সৌকর্য্যার্থ এত অধিক পরিমাণে দান আজও পর্য্যন্ত কেহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

তদীয় অর্থব্যয়ে পরিচালিত বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের কথা ইতিপূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। একমাত্র এই কলেজ স্থাপনেই তাঁহার দেড় লক্ষেরও অধিক অর্থব্যয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলেজসংলগ্ন কলেজের ও স্কুলের বোর্ডিংএর জন্য তাঁহার বাৎসরিক পনর হাজার টাকা ব্যয় হয়। কলেজ গৃহের জন্য তিনি একা দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পলিটেক্‌নিক্ বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য উচ্চইংরেজী স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা সমস্যা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ঐ সকল কার্য্যে তাঁহার বার্ষিক ৬০ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় হইয়াছে। রংপুর কলেজ ও দৌলত পুর কলেজ স্থাপনের সময় তিনি অকাতরে বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

বিজ্ঞান জগতের যাতুকর আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ "বসু বিজ্ঞান মন্দিরে" (Bose's Institute) তিনি একলক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়েও এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন। বহরমপুরে একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপনের জন্য একবার চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয় (Deaf & Dumb School) এবং অন্ধ বালক বালিকাগণের স্কুলে (Blind children's School) তিনি প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

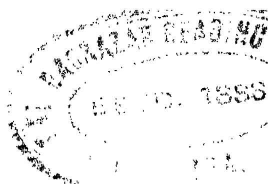
সংস্কৃত কলেজের প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রের বেতন তিনি নিয়মিত ভাবে প্রদান করিতেন এবং দরিদ্র পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের জন্য তিনি বাৎসরিক প্রায় তুই হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। তাঁহার ব্যয়ে প্রতিবৎসর প্রায় দেড়শত ছাত্রের আহার, বাসস্থান ও পড়ার খরচ নির্ব্বাহ হইত।

অর্থলাভ করাই চরম সৌভাগ্য নহে। অর্থ লাভ করিয়া সেই অর্থের সদ্ব্যয় দ্বারা আর্ত্তের তুঃখ হরণ, অভাবগ্রস্তের অভাব নাশ, শিক্ষা বিস্তার, দেশের কল্যাণ সাধন করাতেই প্রকৃত সৌভাগ্যের সূচনা হয়। কত কত ধনকুবের আমাদের দেশে আছেন যাঁহারা রাশিকৃত অর্থের প্রভু হইয়া সেই স্তূপীকৃত অর্থরাশির উপর বসিয়া কেবলই টাকার স্বপ্ন দেখেন। ইহজীবনে অর্থব্যয় দ্বারা তাঁহারা পরের উপকার ত করেনই না পরন্তু কৃপণতা বা অসদ্ব্যয় দ্বারা আত্মবঞ্চনা পূর্ব্বক তুর্দ্দশাগ্রস্ত

জাতির দুঃখ অবিচলিত চিত্তে দেখেন। তাঁহারা আর যাই হউন জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন। মহারাজা বাহাদুরের দান প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন ঃ—

"I have known his great charities since 1915 when I had the honour of coming in contact with the Maharaja Bahadur ; but I never realised, till I came here, what was the quantity of these charities. I understand from reliable sources that they amount to more than one crore of rupees··· I do not recollect a single Parsee name that has exceeded the charities of Kasimbazar.

মহারাজের দানকার্য্যের আলোচনা করিতে হইলে মহাত্মার সঙ্গে স্বর মিলাইয়া বলিতে হয় যে বাস্তবিকই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দান জগতে অতুলনীয়।



বিদ্যানুরাগ

বিদ্যার মর্য্যাদা না বুঝিলে শিক্ষা ও সাহিত্যের জন্য দান করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। মহারাজা নিজে অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন, বিদ্যার মর্য্যাদা বুঝিতেন সুতরাং দেশে যাহাতে বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষিত ও বিদ্বানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য আজীবন অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন।—তিনি যে ইহ জীবনে কত সাহিত্যিক, কত গ্রন্থকার, কত গবেষণাব্রতী ছাত্রগণকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রাচীন শাস্ত্রোদ্ধারে ব্রতী পণ্ডিতগণকে তিনি অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতেন। মহারাজার আশ্রয়ের শীতল ও শ্যামকুঞ্জে বসিয়া এই সকল শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ অনেক প্রাচীন শাস্ত্রের উদ্ধার সাধন করিয়া তাহা সাধারণের গোচর করিয়াছেন।

লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ বলিয়া আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। নৈরাশ্যের তাড়নায় যাহারই মুখ হইতে একথা প্রথম উচ্চারিত হইয়া থাকুক না কেন এ ধারণা কখনই সত্য হইতে পারে না। যে দুই দেবীকে দশভুজা মহাশক্তির দুইপার্শ্বে বসাইয়া আমরা পূজা করি তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ বিবাদ থাকা অসম্ভব। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহারই গৃহের শান্তিকুঞ্জে

সদা সর্ব্বদা ফুল্লমনে কমলা ও বাগ্‌দেবী বিরাজ করিতেন। বাগ্দেবীর অনুগ্রহে তিনি বিদ্যার মর্য্যাদা বুঝিতেন এবং কমলার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে তিনি অর্থদান করিতেন। বাংলাদেশে তাঁহার অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অতি কম।

পঞ্জিকা সংস্কারে মহারাজা।

এতদ্দেশীয় পঞ্জিকাকারগণ যে আদিবিন্দু ধরিয়া গণনা করেন তাহা লইয়া একটা মতভেদ চলিতেছে এবং আধুনিক পঞ্জিকাগণনার ধারা ভ্রমাত্মক বলিয়া পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনসমাজে বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে। মহারাজা একাধিক বার পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য ভারতের যাবতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া এক বিচার সভার অধিবেশন করেন। সভাও হয় কিন্তু সভায় কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। কিছুদিন পরে পুনরায় এইরূপ এক মহতী সভার অনুষ্ঠান করা হয়। আজও পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয় নাই। মহারাজা এজন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন মহারাজার স্মৃতিকে সম্মান করিতে হইলে আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর উচিত যে তাঁহারা পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার সাধন পূর্ব্বক মহারাজের জীবিতকালের আন্তরিক ইচ্ছাপূর্ণ করেন।

দেশীয় শিল্পোদ্ধারে মহারাজা।

মহারাজার একমাত্র শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই মহারাজাকে অবনীতলে অমর করিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। জগতে আজও পর্য্যন্ত যাহারা জ্ঞান, গরিমা ও খ্যাতি প্রতিপত্তির উচ্চতম শিখরে আরোহন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই কোন না কোন এক বিশেষ গুণসম্পন্ন ছিলেন অথবা কোন এক বিশেষ কার্য্যের দ্বারা উন্নতি ও সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। মহারাজার ন্যায় একাধারে এতগুলি মহৎ গুণের দৃষ্টান্ত অন্য কাহারও মধ্যে বিরল বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিপন্ন জাতির জন্য তিনি এত অধিক ভাবিতেন যে কিসে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে নিয়ত তাহারই উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত থাকিতেন। কিরূপ শিক্ষা দ্বারা আমাদের দেশের বেকার ও অন্নবস্ত্র সমস্যা দূর হইবে এবং কি প্রকারে আমাদের জাতীয় শিল্প উন্নত হইবে মহারাজা নিয়ত তাহাই চিন্তা করিতেন এবং তাঁহার চিন্তাপ্রণালী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অকাতরে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেন। বেঙ্গল পটারিজ্ লিমিটেড্ (Bengal Potteries Ltd.) রাজগাঁ ষ্টোন ওয়ার্কস্ (Rajgaon Stone Works Ltd) চাইবাসার চীনমাটীর কারখানা (China clay Factory) প্রভৃতি শিল্প নিকেতনগুলি নিজেদের অস্তিত্বের জন্য মহারাজার দানশীলতার নিকট ঋণী।

একবার কোন শিল্পভবনে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার একটি আঙ্গুল পুড়িয়া যায়। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ না হইয়া তথায় তাঁহার আরদ্ধ কার্য্য শেষ করেন এবং আজীবন শিল্পগারে যাতায়াত ও তৎতৎ প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাতায়াত করিতে থাকেন।

তাঁহার এই শিল্প সাধনায় দেশবাসী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ছলে কলিকাতা কংগ্রেসের সহিত প্রথম যে শিল্পপ্রদর্শনী হয় তাহার উদ্বোধন মহারাজার দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লন। বাংলা দেশের চরম দুর্ভাগ্য যে এতাদৃশ মহাপুরুষ আজ আমাদিগকে কাঁদাইয়া দূরে—বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন।

এই দারুণ অন্ন সমস্যার দিনে সহস্র সহস্র অন্নহীন বেকার ভদ্রসন্তানের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া মহারাজা জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে স্বরাজ বা স্বাধীনতা চিরদিন অলীক কল্পনা বা সুখের স্বপনের মতই থাকিয়া যাইবে। দেশের রাষ্ট্রনেতারা দেশের প্রকৃত মুক্তিকামী সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা সাধারণের রাষ্ট্রগত অধিকার লইয়া যতটা মস্তিষ্কচালনা করিতেছেন, অন্নহীন জাতির অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া সেইরূপ মস্তিষ্ক চালনা করিলে দেশের বিপুল কষ্ট দূরীভূত হইতে পারে। ক্ষুধার তাড়না, অভাবের নিপীড়ন, অন্তরের বেদনা ভিন্ন দুঃখী ভারতবাসীর আর ব্যক্তিগত

সম্পত্তি কিছুই নাই, কিসের অবলম্বনে এই বিত্তহারা কাঙ্গালের দল আজ রাষ্ট্র সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবে ?

মহারাজা ইহা বুঝিতেন। জাতির এই মর্ম্মবেদনা তাঁহার অন্তরকে চিরদিন সহানুভূতির আকুল ক্রন্দনে ভরাইয়া রাখিয়াছিল। তাই সংসারে অর্থের অনটন বা অন্য কোন প্রকার বিসদৃশ বাধা বিপত্তি একদিনের তরেও তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। পরের জন্য নিজে কাঙাল সাজিয়া বৈষ্ণবতার যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বর্ত্তমানযুগে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানবজাতির শ্রদ্ধার জিনিস হইয়া থাকিবে। বাংলার ইতিহাসে বাংলার এই "জনকের" নাম বাঙ্গালীর কাছে বিরাট গর্ব্ব ও মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

বাংলা দেশের সমসাময়িক প্রায় যাবতীয় মঙ্গলকর আন্দোলন ও অনুষ্ঠানের সহিত মহারাজার আন্তরিক সহানুভূতি ও সংশ্রব ছিল। এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা দেশের এবং অবস্থার গতি বিবেচনা করিয়া দেশের কার্য্যে যোগদান করেন এবং প্রতিকূল ঘটনা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ান। এইরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক। ইঁহারা অত্যন্ত সুযোগবেত্তা এবং 'ঝোপ বুঝিয়া কোপ' মারিয়া অত্যন্ত ফাঁকা ভিত্তির উপর নিজেদের সুনামের সৌধ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করেন। অবশ্য পরিণামে ইঁহাদের এই সুনামের সাধের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে—তাঁহাদের ফাঁকা চালবাজী ধরা পড়িয়া যায়। মহারাজা এই শ্রেণীর লোককে

আন্তরিক ঘৃণা করিতেন এবং সর্ব্বদাই ক্ষমা ও করুণার যোগ্য বলিয়া মনে করিতেন। আর এক শ্রেণীর লোক আছে।—

"প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে তুর্জ্জয়
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ—"

এই শ্রেণীর লোক যেমন সাধারনের কোন প্রকৃত হিতসাধন করিতে পারেন না সেইরূপ সাধারণের নিকট কোনও প্রকার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন না। পরন্তু প্রকৃত কাজ করিবার শক্তিও ইহাদের কখন থাকে না। লোকলজ্জা, রাজরোষ, স্বার্থহানি ইত্যাদি নানারূপ তুশ্চিন্তায় ইঁহাদের কর্ম্মশক্তি লোপ পাইয়া যায়। তখন ইহারা বরং বিপরীত কর্ম্মই করিয়া বসেন। অনেকে এইরূপে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সাধারণের স্বার্থহানি করিয়া ইঁহারা বিশেষ এক শ্রেণীর নিকট যে সম্মান পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছেন তাহা কখনই লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিশেষ করিয়া অপমানিতই হইয়াছেন। বিনা আন্তরিকতায় প্রকৃত কাজ হয় না এবং প্রকৃত কাজ করিতে না পারিলে কেহ কখনই লোকের হৃদয় জয় করিতে পারে না। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নাম ও যশের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজের সুবিবেচনা অনুসারে সাধ্যমত এবং কখনও বা সাধ্যাতীত রূপেও সাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সফলতা ও যশ, তুইই অর্জ্জন করিয়াছেন। বিগত ২০।২৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তিনি সমানভাবে একই নীতি অনুসারে সাধারণের

সেবা করিয়াছেন। কোনদিন কোন কারণে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাধারণের মঙ্গলার্থ তিনি যখন যাহা উচিত ও হিতকর মনে করিয়াছেন তখনই তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—কাহারও ভ্রূকুটী বা ভীতিপ্রদর্শনে অনুমাত্রও বিচলিত হন নাই।

———

বঙ্গভঙ্গে মহারাজা।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কুর্জ্জন বাঙ্গলার জনমত পদদলিত করিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে রাষ্ট্রগত ভেদ জন্মাইবার আশায় সোনার বাংলার মাঝখানে এক রাজনীতির প্রাচীর উঠাইয়া দিয়া 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' করিয়া দিলেন। সমস্ত বাংলাদেশ জুড়িয়া ক্রন্দন ও হাহাকার উঠিয়া গেল। হিন্দুগণ দলবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে সভাসমিতি করিয়া সরকারের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে সংকল্প করিলেন। দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুবিবেচক, ও বিদ্বান্ মুসলমান ভ্রাতৃগণও এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। কতিপয় স্বার্থান্ধ মুসলমান এই আন্দলনের বিরুদ্ধতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলনে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। বাংলাদেশে সাতকোটী লোকের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও ন্যায়ের জয় হইয়াছে, অন্যায় জয়লাভ করিতে পারে নাই।

যাহা হউক এই আন্দোলন আরম্ভ হইবার সূচনায় কলিকাতার জনসাধারণ সমবেত হইয়া কলিকাতা টাউন হলে (Town Hall) এক বিরাট সভা করেন। এই সভায় কলিকাতার প্রত্যেক গণ্যমান্য স্বদেশপ্রাণ মহাত্মা এবং

অপরাপর সাধারণ যোগদান করিয়া সভাগৃহকে একটি বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত করিয়া ফেলেন। স্বর্গীয় মহারাজা লর্ড কুর্জ্জনের কার্য্যের প্রতিবাদে যে তেজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার কতকটুকু মূল ইংরাজী ও বাংলা উভয় অংশই আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলাম। এইবক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনিই সর্ব্বপ্রথম **স্বদেশী** গ্রহণ ও **বিদেশী বর্জ্জনের প্রস্তাব** উত্থাপন **করেন এবং গভর্ণমেণ্টের অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ দেশবাসীকে একান্ত ও অনন্যচিত্ত হইয়া বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জ্জন (Boycott of foreign goods) করিয়া** স্বদেশ জাত দ্রব্য আদর **করিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।**

তাঁহার এই সুযুক্তিপূর্ণ অনুরোধ পালন করিবার জন্য দেশবাসিগণ একান্ত যত্নপর হইয়া উঠেন। তখন স্থানে স্থানে 'বিদেশীবর্জ্জন' প্রচার করিবার জন্য সভা সমিতি আরম্ভ হয়। নগর-সংকীর্ত্তন ও মাতৃবন্দনার গানে আঁকের গুড়ের 'হরিরলুট' হইতে থাকে। বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয় বক্তা 'সুরেন্দ্রনাথ' আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে মাতৃ সাধনার মূলমন্ত্র 'বিদেশীবর্জ্জন' প্রচার করিয়া বেড়াইতে থাকেন। বাংলার কবি তখন গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

মাতৃবন্দনায় উচ্ছ্বসিতকণ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন,

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনি'—
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী !"

গানে, ধ্যানে, সাধনায় বাঙ্গালীজাতি এক শক্তির উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ধন্য কুর্জ্জন বাহাদুর ! অশুভের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা দেশে তুমি পরম কল্যাণ আনয়ন করিয়াছিলে। তোমারই নির্ম্মম কশাঘাতে বাঙ্গলার যুগযুগান্তের নিদ্রালু জাতি দেশাত্মবোধের প্রেরণায় জাগ্রত হইয়াছিল !

আজ ভারতের সর্ব্বত্র দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। বহু তরুণ প্রাণ, বহু অকৃত্রিম দেশভক্তের পবিত্র প্রাণ এই বিরাট সাধনযজ্ঞের বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। সরকার এই আন্দোলন নিবৃত্তি করিবার জন্য কঠোর দমননীতি (Repression Policy) অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু জাতি আজ হাসি মুখে শাস্তি ও মৃত্যু বরণ করিয়াও তীব্র সাধনা করিতেছে।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম তখন বাংলাদেশে এমন করিয়া দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠে নাই। বাংলার লোক তখন ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখিতেছে। এমন সময় লর্ড কূর্জ্জনের ভেদনীতি প্রবর্ত্তিত হইল। মনে হয় নিজের পাণ্ডিত্যাভিমানে লর্ড কুর্জ্জন জাতির মনস্তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বঙ্গভঙ্গরূপ কার্য্যের ফলে সারা বাংলায় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে

বাঙ্গালীর এক কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম বাধিয়া গেল। একদিকে কুর্জ্জনের জিদ ও ফুলারের স্বৈরাচার অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে সরকারের সহিত অসহযোগে কৃতসংকল্প বাঙ্গালীর শক্তিশালী জনমত।

এই সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার, ভূপেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বাঙ্গালী নেতৃগণের উদ্যম আর এই উদ্যমের মূলে রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্রের বিপুল প্রেরণা—যুদ্ধে জয় করায়ত্ব না করিয়া ইঁহারা কেহই নিবৃত্ত হন নাই। জাতির এই জীবনমরণের সমস্যা—স্বাধীনতা সংগ্রাম আজিও শেষ হয় নাই, কতকাল চলিবে কেহ বলিতে পারে না—কিন্তু এই সংগ্রাম ও শক্তির মূলে যাঁহার বিপুল প্রেরণা আছে তাঁহার চরণে আজ আপনা হইতেই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

এইরূপে এ দেশে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র রাজনীতি ক্ষেত্রে এক বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন।

দেশীয় লোকের অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টায়।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকাকালে নিয়ত দেশীয় লোকের অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টাই করিয়া গিয়াছেন। প্রতিকার্য্যে প্রতি ঘটনায় তিনি সর্ব্বদা অত্যন্ত কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন আলোচনা প্রসঙ্গে কোন জীবনীকার লিখিয়াছেন—

"বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হইবার দিন পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সভার অধিবেশন হইয়া গেল। ভারতীয় সদস্যেরা একের পর একজন প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ করিলেন। বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের জিদ—সেইদিনই আইন পাশ করিবেন। তাই সন্ধ্যায় আবার অধিবেশন হইল। তখনও কাজ শেষ হইল না। রাত্রিতে আবার অধিবেশন। তখন বুঝা গিয়াছে, সরকার পক্ষ ভোটের আধিক্যে আইন পাশ করিয়া লইবেন এবং সেইজন্য দিল্লীর দারুণ শীতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গলার অন্য প্রতিনিধিরা আর রাত্রির অধিবেশনে গমন করিলেন না। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহারাজা শেষপর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া রাত্রি ১ টার সময় বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া তবে গৃহে ফিরিলেন।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের পূর্ব্বে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল ভারতীয় সদস্য শাসন সংস্কার চাহিয়া বড়লাটের কাছে পত্র লিখেন, তাঁহাদিগের তালিকায় প্রথম সাক্ষর—মহারাজা নন্দীর। অন্য স্বাক্ষরকারিদিগের মধ্যে ছিলেন—সার দীনসা ওয়াচা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সার তেজ-বাহাদুর সপরু, সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, সার নরসিংহেশ্বর শর্ম্মা, রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর ও মামুদাবাদের মহারাজা।

জিলাবোর্ডের কার্য্যে

১৯১৫ খৃঃ মহারাজা বাহাদুর K. C. I. E. উপাধী লাভ করেন। তিনি বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর এবং মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে বহুকাল এক নির্দ্দিষ্ট ও সুচারু কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাধারণের সেবা করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের কার্য্যে ইঁহার এরূপ গভীর মনোযোগ ছিল যে প্রায় সকল সময়ই ইনি অনন্যমনা হইয়া এই কাজের কথাই চিন্তা করিতেন। মৃতুশয্যায় বিকারের ঘোরেও মহারাজা মুর্শিদাবাদ জিলা বোর্ডের ফাইলের কথা বলিয়াছিলেন। এইরূপ অনন্যমনা হইয়া দেশের কাজ না করিলে দেশের প্রকৃত উপকার করা যায় না। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় মধ্যে যে দেবতা ছিলেন তিনি এইরূপেই সাধারণের জন্য অনুভব করিতেন। তাই আজ সকলহৃদয়ে সমান শ্রদ্ধার সহিত দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। তিনি দেশকে প্রকৃতই ভালবাসিতেন ও তিনি দেশের কল্যানের জন্য চিন্তা করিতেন। আজ তাঁহার তিরোধানে আমরা সত্য সত্যই নিস্ব হইয়া পড়িয়াছি। তবে আশা আছে তাঁহার পুন্যআশীর্ব্বাদে আমাদের পরমকল্যান হইবে।

ভক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র

শুধু কর্ম্মজীবন ও রাজনৈতিক জীবন লইয়া আলোচনা করিলে মহারাজার জীবনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যিনি এত বড় দানশীল ছিলেন তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি যে কত গভীর ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। একটি ইংরাজী কবিতার মর্ম্মার্থ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে আবু বেন আদম নামক একব্যক্তি লোকসেবা দ্বারা ভগবানের পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। বাস্তব জগতে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রও তাহাই করিতে পারিয়াছিলেন। মানবসেবা তাঁহার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল এবং এই সেবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মধ্যে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাস্তবিকই ভগবানে প্রীতি ও ভক্তি অসামান্য এবং নিশ্চলা না হইলে এতবড় আত্মত্যাগ কখনই সম্ভব হয় না।

'তৃণাদপি সুণীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা'

'তৃনাদপি' সুনীচ ও 'তরোরিব' সহিষ্ণু, আত্মবিলাসব্যসন ত্যাগী রাজর্ষি মহাবৈষ্ণব মণীন্দ্রচন্দ্রের মধ্যে সত্য সত্যই শ্রীভগবান বিরাজ করিতেন—একটা কিংবদন্তী আছে—

পুরীর রথ যাত্রায়

পুরীর মন্দিরে উৎসব কীর্ত্তন হইতেছে, সেই কীর্ত্তনের আসরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র উপবিষ্ট। এক বৃদ্ধা—জীর্ণ মলিনবাস পরিধান করিয়া কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছিলেন। তিনি মহারাজার নিকটে আসিয়া পড়িলে মহারাজার পার্শ্বচরেরা বৃদ্ধাকে তথা হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া মহারাজ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং একটু সরিয়া যাইয়া বৃদ্ধার বসিবার স্থান করিয়া দিয়া বলিলেন, "মা বস।" কিম্বদন্তী আছে, একবার রথের সময় রথরজ্জু আকৃষ্ট হইলেও রথ চলে নাই। পাণ্ডাগণ ও জনতা অনাচার হইয়াছে মনে করিয়া ভয় পাইল। এমন সময় এক বৃদ্ধা দৌড়াইয়া আসিয়া রথরজ্জুতে হস্তার্পণ করিল। তখন রথ চলিল। জগন্নাথ ভক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন, পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় তাহা প্রতিপন্ন হয়।

গত কুম্ভমেলা

গত কুম্ভের সময় হরিদ্বারে এক বৃদ্ধা স্রোতের টানে পড়িলে মহারাজা নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, ফলে তিনি বহুদিন অসুস্থ ছিলেন।

এমন বহুদিন গিয়াছে স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীহরির নামগানে আপনা হারা হইয়া রহিয়াছেন। কত কত হরি সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সকলের সঙ্গে নামমহিমায় বিভোর হইয়া মহারাজা পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। একই মানুষের মধ্যে

একাধারে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, স্বজন ও স্বজাতিতে অনুরাগ, দেশপ্রীতি, সেবার আগ্রহ, পরদুঃখ মোচনের ব্যগ্র চেষ্টা, তেজস্বিতা এতগুলি গুণের সমাবেশ জগতে অতি বিরল। এক কথায় বলিতে গেলে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য্য বিদ্যমান ছিল। রাজা ভূস্বামী—মহারাজা 'সর্ব্বস্বামীগুণোপেত' ছিলেন। যখন যে দিকে চাই কেবলই তাঁহার অসীম গুণরাজির কথাই মনে পড়ে। এই মহাপুরুষের তিরোধানে সমগ্র দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করিবার কোন উপায় নাই। ভাষা, এইখানেই ব্যর্থ ও শক্তিহীন। এই বিষাদের ঘনান্ধকারে বসিয়া মরণবিজয়ী মহাপুরুষের জন্য যখন প্রাণ আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে, তখন শুধু মনে হয় বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব গিয়াছে - বাঙ্গালীর বুকের বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে—মৃত্যুরাক্ষস বাঙ্গালীর হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগা বাঙ্গালী জাতি! আর আমাদের কিছুই নাই, সকল গর্ব্ব, সকল অহঙ্কার নিয়তির ভ্রূকুটিতে ডুবিয়া গিয়াছে এখন শুধু—

"ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না।"

আর কি বাংলার সুদিন ফিরিয়া আসিবে, আবার কি বাংলার ঘরে ঘরে সাঁজের প্রদীপ জ্বলিবে! আজ যে বাঙ্গালীর দিন নিকটবর্ত্তী—

"দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জ্বল্‌ল্ না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়"—

মরনোন্মুখ বাঙ্গালী জাতি আজ 'বেলা শেষের' 'শেষ খেয়ায়' পাড়ি দিবার আশায় বসিয়া আছে। আর বাঙ্গালীর কেউ নাই—

"ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

এই স্তিমিত সন্ধ্যালোকে, নিশান্ধকারের অভ্যুদয়ে, বাঙ্গালীর এমন সুহৃদ আর কে আছে যে তাহাকে ডাকিয়া লইবে। কাঁদ বাঙ্গালী কাঁদ,—কিন্তু ধীরে—অতি ধীরে—

"চোখের জলে ভিজে আওয়াজ কেউ যেন না শোনে।"

চরিত্রের বিশেষত্ব।

মহারাজার চরিত্রের বিশেষত্ব কি তাহা বাংলাদেশে কাহারও অবিদিত নাই। একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। 'ঐহিক অমরতা' প্রবন্ধে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ জগতে মানবের ঐহিক অমরতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার কীর্ত্তি দিয়া। যখনই কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা আমাদের মনে পড়ে তখনই তাহার সকল গুণের কথা, সকল অবস্থা ও বৈচিত্র্যের কথা আমাদের মনে পড়িয়া যায়। আমরা তখন ভাবি—'আমি ভুলি না'। তিনি বলিয়াছেন—"বাল্মিকী একস্থানে বসিয়া এক সময়ে আপনার বীণা বাজাইয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণ যে স্থানে সারস্বতবর্গ সেইখানেই তাঁহার বীণার ঝঙ্কার, যেখানে আনন্দ উৎসব সেইখানেই তাঁহার বীণার ধ্বনি, যেখানে হৃদয় হৃদয়ের সহিত আলাপ করে, মন মনের সহিত মিলিয়া যায়, আত্মা আত্মার সহিত আপনার বিনিময় করিতে চাহে সেইখানেই তাঁহার বিশ্বমোহিনী বীণার বিনোদনিস্বর। এইরূপ কত অগণিত আত্মা লোকস্মৃতির অমরাবতীকে উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে তাহা চাহিয়া দেখ। যদি অবনীর এই সকল সন্তানও মরিয়া গিয়া থাকেন তবে জীবিত আছে কাহারা?"

বস্তুতঃই গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা সকলেই এই গভীর এবং তীব্র সত্যের দুয়ারে উপনীত হইতে পারি।

একটা কথা মনে হয়। রাম-বিরহিনী জানকী কবে একদিন প্রিয়তমের বিরহ-বেদনায় কাতর হইয়া 'হা রাম' 'হা রাম' বলিতে বলিতে বিপুল শোকাবেগে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিয়া ছিলেন, আজও তিনি তেমনি ভাবে আমাদের মধ্যে কাঁদিয়া থাকেন। যেখানে পরমপতিব্রতা সতীর তীব্র বিরহবেদনা ও আকুল অশ্রুজল সেইখানেই বিরহবিধুরা সীতা। আজিও পতিবিরহিণী, দুঃখিনী, রোরুদ্যমানা রমণীর বিষাদপাণ্ডুর মুখ দেখিলে আমাদের মনে হয়—

'কোথায় সীতা, কোথায় সীতা
জ্বল্‌ছে বুকে স্মৃতির চিতা'—

আর তখনই আমাদের অন্তর ভরিয়া ক্রন্দন জাগে—তখনই—

অন্ধকারের অন্তরেতে
অশ্রুবাদল ঝরে।'

যেখানেই দয়া, মায়া ক্ষমা, প্রীতি অথবা ত্যাগ দেখা যায় সেখানেই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের অমরস্মৃতি বিরাজ করিতেছে। দয়ার যিনি অবতার, ক্ষমার যিনি আধার, প্রীতিতে যাঁহার মহিমা ও ত্যাগে যাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত সেই মহাপুরুষের তিরোধান হয় নাই। তিনি মানবের হৃদয়-মন্দিরে অমর হইয়া বাঁচিয়া আছেন। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য বিরাজ করিবে, যত দিন সপ্তদ্বীপা ধরণীতে জন্মমৃত্যুর লীলা-খেলা চলিবে, যত দিন দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা প্রভৃতির গৌরব থাকিবে ততদিন মহারাজা আমাদের থাকিবেন, তাঁহার স্মৃতি আমাদের একান্ত নিজস্ব হইয়া

থাকিবে, আমাদের সকল কার্য্যে ও সকল ধর্ম্মে তাঁহার আশীর্ব্বাদ শান্তিসুধা সিঞ্চন করিতে থাকিবে।

পারিবারিক জীবনে

তাঁহার পারিবারিক জীবনেও তিনি যে মহত্ব ও অসাধারণত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। তাঁহার পরিবারের মধ্যে স্বয়ং মহারাণী হইতে সামান্য দাসদাসী পর্য্যন্ত কেহই কোনও দিন কোনও কারণে তাঁহার ব্যবহারে এতটুকু অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সকলের মর্ম্মব্যথা তিনি নিজের প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পারিতেন এবং সকলের সকল ব্যথাই তিনি প্রাণপণ আয়াস স্বীকার করিয়া দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। পক্ষান্তরে পরিবারের সকলেই তাঁহার এই মহানুভবতা উপলব্ধি করিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার কার্য্য করিবার গৌরব অর্জ্জন করিতে যত্নপর হইত। শুনা যায় তাঁহার নিকট একবার যে অপরাধ করিয়াছে সমস্ত জীবনই তাহাকে সেই একটি অপরাধের জন্য অনুতাপ করিতে হইয়াছে।

একটা গল্প আছে যে কোন রাজ্যের এক জনপদ বিদ্রোহী হইলে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী রাজার নিকট বিদ্রোহীদের ধ্বংস পূর্ব্বক বিদ্রোহ দমন করিয়া আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সসৈন্যে বিদ্রোহী-জনপদে যান। প্রধান মন্ত্রী যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন রাজ্যে আর বিদ্রোহের অস্তিত্ব মাত্রও ছিলনা কিন্তু যে সমস্ত নেতারা বিদ্রোহ করিয়া ছিলেন তাঁহারা সকলেই জীবিত

ছিলেন। রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কৈ, "আপনি বিদ্রোহীদিগকে ধ্বংশ করিবেন বলিয়া ছিলেন, এখন দেখিতেছি ইহারা প্রত্যেকেই জীবিত আছে।" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, আমি বিদ্রোহীদিগকে সত্যই ধ্বংস করিয়াছি। যাঁহারা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ রাজভক্ত প্রজারূপে আবার পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। ইঁহারা কেহই ত বিদ্রোহী নহেন। শুনা যায় রাজাকে এজন্য কোনদিনও অনুতাপ করিতে হয় নাই।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রও এই প্রকৃতির লোক ছিলেন। অবাধ্য দাসদাসীগণ তাঁহার আচরণে নিজেরাই স্বেচ্ছায় তাঁহার চরণতলে মস্তক লুটাইয়া আনন্দ লাভ করিত। বিদ্রোহ বা অবাধ্যতা—সে অনেক দূরের কথা ;—মহারাজা যে কখনও কাহার সহিত উচ্চকণ্ঠে কথা পর্য্যন্ত বলিতেন না।

দিল্লীদরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া মহারাজা দরবারে যোগদান করিবার জন্য একবার প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি সুদৃশ্য পোষাক প্রস্তুত করান। এই পোষাক প্রস্তুত হইয়া আসিলে মহারাজা তাঁহার 'খাস খানসামা' পরাণকে ইহা যত্নপূর্ব্বক যথাস্থানে রাখিয়া দিতে আদেশ করেন।

এই পরাণের কথা পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। পরাণ বহুদিনের প্রাচীন খানসামা। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময় হইতে পরাণ রাজসংসারে কাজ করিতেছে ; সংসারে সকল বিষয়েই তাহার কিছু না কিছু প্রভুত্ব ছিল।

পোষাক রাখিবার ভার পাইয়া পরাণ হয়ত কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে তৎক্ষণাৎ মহারাজার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে নাই। পরে তাড়াতাড়ি করিতে যাইয়া পরাণের অনবধানতা বশতঃ এই বহুমূল্য মনোরম পরিচ্ছদে খানিকটা কাল কালী লাগিয়া যায়। পরাণ এই ব্যাপারে নিতান্ত ভীত হইয়া প্রথমে মহারাজার নিকট হইতে এই ব্যাপার গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দৈবাৎ উহা মহারাজার নিকট ধরা পড়িয়া যায়। পরাণ মহাভয়ে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। মহারাজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন ঃ—

"পরাণ তুই বুঝতে পার্চ্ছিস না যে আমার কি সর্ব্বনাশ তুই কর্লি। আর এখন এমন সময়ও নেই যে আমি আর একটা পোষাক তৈরী করাই। কি বলব, তোর অবস্থা ভাল নয় নৈলে এর শাস্তি আমি তোকে দিতুম্।"

এত বড় ভয়ানক অনিষ্টের জন্য মহারাজা অসাবধান ভৃত্যকে শুধু এই তিরস্কারটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; উত্তরকালে পরাণের পুত্র এবং জামাতার উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করাইয়া এবং সংসারে তাহাদিগকে সুব্যবস্থিত করাইয়া পরাণের অসাবধানতার শাস্তি দিয়াছিলেন। এই মহানুভবতা, এই আশ্রিতবৎসলতা সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্ভব নহে। এই পরদুঃখ কাতরতা, পরের জন্য বেদনানুভব, ইহারই জন্য উচ্চ, নীচ, নিধন সকলে নির্ব্বিশেষে মহারাজাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

কোন ভদ্রলোক ছাত্রজীবন হইতে মহারাজার করুণা লাভ করিয়া উত্তরকালে সমাজে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশে নেতৃস্থানীয় হইয়াছেন। এই ভদ্রলোককে মহারাজা পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। একবার ইহার মৃদু জ্বর (Slow fever) হয় বলিয়া সকলের মত হওয়াতে মহারাজ ইহার চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে থাকেন। এই ব্যাধির কথা জানিতে পারিয়াই মহারাজা কাল বিলম্ব না করিয়া ইহাকে চুনারে একখানি সুদৃশ্য ভিলা (Villa) ভাড়া করিয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পাঠাইয়া দেন। সদা সর্ব্বদা মহারাজা ইহার জন্য উৎকণ্ঠীত থাকিতেন। বহুদিন চিকিৎসা এবং চুনার হইতে কলিকাতা এবং কলিকাতা হইতে কাশী প্রভৃতি স্থানে ইহাকে পাঠাইয়া মহারাজা প্রচুর অর্থব্যয় এবং দুশ্চিন্তা ভোগের পর ইহাকে আরোগ্য করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সহানুভূতি এই ব্যথাবোধ এ শুধু একমাত্র মহারাজাতেই সম্ভব, অন্যের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায় না।

একবার মহারাজার এক কর্ম্মচারী রাজ তহবিলে হিসাবের গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হিসাব পরিদর্শনের সময় উহা উপরিতন কর্ম্মচারীদিগের নিকট ধরা পড়িয়া যায় এবং প্রকাশ পায় যে শুধু হিসাবের ভুল নহে অনেক টাকারও গোলমাল হইয়াছে। ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় প্রধান কর্ম্মচারী উহা মহারাজার কর্ণগোচর করেন এক

যথারীতি বিচার প্রার্থনা করেন। এইরূপ গুরুতর ব্যাপারে যদি ন্যায় সঙ্গত বিচার এবং অপরাধীর শাস্তি না হয় তবে রাজসরকারের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যাওয়া সম্ভব। সুতরাং যথারীতি প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া মহারাজা উক্ত কর্ম্মচারীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং পদচ্যুত করেন।

একদিন মহারাজা কাশিমবাজার রাজবাটীতে নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া কোন কাজ করিতেছিলেন এমন সময় সেই কর্ম্মচারী ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাজের পা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক চাকুরী প্রার্থনা করিতে লাগিল। করুণার্দ্র হৃদয় মহারাজা এই দরিদ্র অপরাধীর হৃদয়ভেদী আকুল ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার কঠোর কর্ত্তব্য বুদ্ধি সে অবস্থাতেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এই বিপন্ন সহায়সম্পদহীন দরিদ্র কর্ম্মচারীর দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে দয়ার যোগ্য মনে করিলেও শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও আদর্শ নষ্ট করিয়া তাহাকে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করা মহারাজ কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। কিন্তু মহারাজের নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়া কেহ কখনও ব্যর্থ মনোরথ হয় নাই। এই কর্ম্মচারীও ব্যর্থ মনোরথ হইল না। মহারাজা তাহাকে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন না বটে কিন্তু একটি মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া তাহার জীবনযাপনের পথ সুগম করিয়া দিলেন।

বন্ধু বাৎসল্য

বাগবাজারের শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু (বেঙ্গ বাবু) মহারাজার বাল্য সুহৃদ্। এই বন্ধুর সহিত মহারাজার এক অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন ছিল। উভয়ের মধ্যে এরূপ গাঢ় প্রীতি ছিল যে মহারাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন ভাল জিনিষ বা উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাদ্য নিজে ব্যবহার করিতে পারিতেন না। একবার মহারাজা কাশ্মীরে বেড়াইতে যান, একদিন কাশ্মীরে বেড়াইতে বেড়াইতে এক শালের দোকানে হঠাৎ একখানি উত্তম বহুমূল্য শাল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং মহারাজা নিজের ব্যবহারের জন্য ঐ শালখানি ক্রয় করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু ক্রয়ের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুর কথা তাঁহার মনে পড়িয়া যায়। নিজে উত্তম শাল ব্যবহার করিবেন অথচ বন্ধু তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না ইহা মহারাজা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। দোকানে তখন ঐরূপ শাল আর ছিল না, মহারাজা আদেশ দিয়া ঐরূপ আর দুইখানি শাল প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার দুই বন্ধুর জন্য ক্রয় করিলেন। এরূপ বন্ধুপ্রীতি সচরাচর দেখা যায় না।

মানুষের হৃদয় এক উদ্যান বিশেষ। এই উদ্যানে দয়া, ক্ষমা, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি নানারূপে সুগন্ধ কুসুমের বৃক্ষ রোপণ করা আছে। মনুষ্যত্বের বারিসিঞ্চনে এই বৃক্ষ মঞ্জুরিত

হয়—সুগন্ধ কুসুমনিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া নানাদিকে সুরভি বিস্তার করে। মহারাজার অন্তরে বড় হইবার একটি উপাদানেরও অভাব রাখিয়াছিলেন না। এতগুলি উচ্চ-হৃদয়-ভাব একসূত্রে গ্রথিত এবং শ্রীভগবানের করুণা ধারায় অভিষিক্ত হইয়া জগৎ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নতুবা নির্ব্বিশেষে সকল হৃদয় জয় করিবার শক্তি সকলের থাকে না।

নিয়তির চক্রে

এই মহাপুরুষকেও নিয়তির চক্রে জীবনে অনেক শোক-তাপ ভোগ করিতে হইয়াছে। ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করা মানুষের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য্য এবং নিয়তির চক্রভোগ করা দেবতারও অপরিহার্য্য। স্বয়ং ভগবান কোন সময় নিয়তির চক্রে পড়িয়া বজ্রকীটরূপে শিলা কাটিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বজ্রপানি দেবরাজ ইন্দ্র নিয়তির নির্য্যাতনে স্বর্গরাজ্য হারা হইয়া কাঙালের ন্যায় মর্ত্ত্যের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ উগ্রতপা রুদ্রাবতার দুর্ব্বাসাকেও স্কন্ধে করিয়া রাজা নহুষকে বহন করিতে হইয়াছিল।

'নিয়তি কেন বাধ্যতে'—

এই নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের বশীভূত হইয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রকে জীবনে বহু আত্মীয় স্বজন এবং পরিবারস্থ বহু প্রিয়জনের মৃত্যু জনিত গভীর শোক ও মনস্তাপ ভোগ করিতে

হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্ব সময়েই তিনি প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় অবিচলিত ছিলেন। সাংসারিক শোকদুঃখ তাঁহাকে কখনও বিচলিত বা বিকৃতচিত্ত করিতে পারে নাই। সকল সময়ই তিনি এই সাংসারিক দুঃখ তাপ অত্যন্ত গভীর মানসিক শক্তি ও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র মহিমচন্দ্র ও মধ্যমপুত্র কার্ত্তিকচন্দ্রের মৃত্যুতেও তিনি বিচলিত হন নাই। গীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখে উচ্চারিত হইয়াছিল—

—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥"—

'যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা ও সুখে বিগতস্পৃহ, যিনি ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত এবং যিনি স্থিতধী তাঁহাকেই আমি মুনি আখ্যায় অভিহিত করি।' শ্রীভগবানের পরমবাণী অনুসারে আমরাও স্বর্গীয় মহারাজাকে মুনি বলিব। তিনি প্রকৃতই মুনি—প্রকৃত রাজর্ষি ছিলেন।

উদার ধর্ম্মমত

মহারাজার ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার ছিল। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইলেও, কখনও কোন ধর্ম্মের সম্বন্ধে হৃদয়ে কোন প্রকার সংকীর্ণতা পোষণ করিতেন না। বরং তিনি

সর্ব্ব ধর্ম্মেরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বলিতেন—"অহিংসা ও জীবে দয়া" সকল ধর্ম্মের মূলমন্ত্র; এবং এই মন্ত্র সাধনা করিলে যে কোন ধর্ম্ম মতেরই উপাসক হউক না কেন সকলেই দয়াময় ভগবানের করুণালাভ করিবেন। 'জীবে দয়া' তাঁহার প্রকৃতই সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার তিরোধানের প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনে অযথা 'বানরবিনাশ' আরম্ভ হয়। মহারাজা এই অযথা জীবহত্যায় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বৈষ্ণবগণের প্রিয়ভূমি শ্রীভগবানের মধুর লীলা নিকেতন শ্রীধাম বৃন্দাবনে এইরূপ অযথা প্রাণিহত্যা দেখিয়া কাহার না মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হইবে। কলিকাতাবাসি জনগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া এই বানর হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে কৃতসংকল্প হয়। সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহোদয় প্রমুখ কলিকাতার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবগণ এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতা আলবার্ট হলে এক প্রতিবাদ সভা আহুত হয় এবং স্বর্গীয় মহারাজা সেই সভায় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া এই অমানুষিক জীবহত্যার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বহুপূর্ব্বে পুরীধামেও একবার এইরূপ বানর হত্যা আরম্ভ হয়, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কথায় গভর্ণমেণ্ট এই হত্যাকাণ্ড নিবৃত্ত করেন। এই আন্দোলনে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রেরও যোগ ছিল।

বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান

মহারাজার ধর্ম্মমত যে কত উদার ছিল তাহা তাঁহার বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান হইতেই বেশ বোঝা যায়। অধুনা কলিকাতা গোলদীঘীর পাড়ে 'ধর্ম্মরাজিক চৈত্যবিহার' নামে যে সুরম্য বৌদ্ধ প্রাসাদ আছে তাহার নির্ম্মাণকালে ঐ ভূমি স্বর্গীয় মহারাজাই দান করিয়াছিলেন। এই দানই তাঁহার উদার ধর্ম্মমতের সাক্ষ্যরূপে চিরদিন বিরাজ করিবে।

পুত্র শ্রীশচন্দ্র

মহারাজা আজ স্বর্গগত। তাঁহার তিরোধানের পর শোকাতুরা বিধবা মহারাণী ও পিতৃশোক ব্যাকুলিতা চারিটি রাজকন্যা ব্যতীত তাঁহার ধন সম্পত্তি, পারিবারিক খ্যাতি, সুনাম ও রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী তাঁহার একমাত্র পুত্র মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী। মহারাজকুমার পিতার যোগ্য পুত্র। ইনি অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং সুবিবেচক এবং অতি তরুণ বয়সেই অনেক কার্য্যে স্থৈর্য্য ও বিবেচনাশক্তির পরিচয় দিয়া বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং এম, এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং পিতার প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় বিদ্যা নিকেতনগুলির প্রত্যক্ষ পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রশংসার সহিত সেই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতেছেন। ইনি একাধারে দুইবার বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Council) সভ্য মনোনীত হইয়া যথাসম্ভব সাধারণের স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে ইনি "Unionist Party" ইউনিয়নিষ্ট দলভুক্ত। পরে ব্যবস্থাপক সভায় নানারূপ দলাদলি ও নানা বিভিন্ন মতবাদ ও পরস্পরের মধ্যে একতাহীনতা দেখিয়াই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বৎসরে ইনি আর মনোনয়ন প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান নাই।

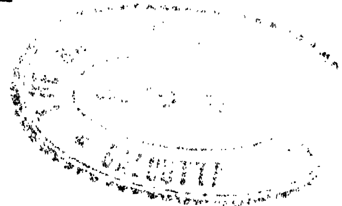
ইনি পিতার জীবিতাবস্থাতেই ষ্টেটের কাজকর্ম্ম দেখিতেন এবং ষ্টেট সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেন। পিতার অবর্ত্তমানে ইহারই স্কন্ধের উপর সমস্ত দায়িত্বভার পড়িয়াছে। আশা হয়, বয়সে নবীন হইলেও মহারাজকুমার স্বীয় সুবিবেচনা প্রণোদিত হইয়া উত্তরোত্তর স্বীয় ষ্টেট ও প্রজাকুলের মঙ্গল সাধন করিবেন।

মহারাজকুমার বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে তিনি মিউনিসিপ্যালিটীর অনেক বিষয় অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

দিঘাপতিয়ায় স্বর্গীয় রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মহারাজকুমারের বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহে সে বৎসর মহারাজা যেরূপ সমারোহ করিয়াছিলেন সেরূপ সচরাচর দেখা যায় যায় না, অসংখ্য নিমন্ত্রিত অভ্যাগত ও অতিথিগণকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজনাদি করাইয়া স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র যথোচিত সমাদর দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত

করিয়াছিলেন, যাঁহারাই এই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন, মহারাজের সৌজন্য ও আতিথেয়তার কথা তাঁহাদের আজীবন মনে থাকিয়া যাইবে।

বিগত ১৯২৮ সনের প্রথমভাগে মহারাজকুমারের একটি পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় মহারাজার যথেষ্ট আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। শ্রীভগবানের দয়ায় কাশিমবাজার রাজবংশের এই ক্ষুদ্র রাজপুত্রটি জীবিত থাকিয়া পিতামাতা এবং প্রজাবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি এই নয়নাভিরাম কুমার দীর্ঘজীবি হইয়া রাজবংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়া সকলের নিকট বিপুল গৌরব অর্জ্জন করুন।



মহাপ্রয়াণ

"পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজ মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া !—"

রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা ১৩৩৬ সন বড় দুর্ব্বৎসর। এই দুর্ব্বৎসরেই বাংলার মৃত্যুঞ্জয় বীর, কর্ম্মী ও দেশভক্ত যতীন্দ্রনাথ "রাজরোষের" আগুনে জ্বলিয়া ৬৩ দিন অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকার পর লাহোরের বোরষ্টাল জেল হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন। বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া এই বৎসরকে বাংলাদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সামাজিক বিপ্লবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে শুধু বাংলা দেশ নহে সমগ্র ভারতবর্ষে যে বিপুল পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে তাহার ফল বোধ হয় বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে ভোগ করিতে হইবে। রায় সাহেব হরবিলাস সারদার প্রস্তাবিত বিপ্লবকারী বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন (Child marriage Restraint Act of 1929) এই বৎসর কতকগুলি ইঙ্গবঙ্গ সংস্কার প্রয়াসী তথাকথিত সমাজ হিতৈষীগণের অনুকূল ভোটে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Assembly) পাশ হইয়া গিয়াছে। এই আইন পাশ হওয়ায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেরই মূলনীতির উপর আঘাত পড়িয়াছে।

আমাদের দেশের রাজা বিদেশী এবং বিধর্ম্মী, এই বিদেশী এবং বিধর্ম্মী রাজশক্তি যদি আমাদের হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের সামাজিক প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়াসী হন তাহা হইলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার কথা নাই বটে কিন্তু আমাদের সামাজিক অকল্যানের জন্য শোক প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের আছে। এই যে শোক ইহাও সরকারের কার্য্যের জন্য— আমাদের শোক তাঁহাদেরই অন্যায় ও অসমীচিন কার্য্যের জন্য তাঁহারা বিদেশী ও বিধর্ম্ম সরকারের দ্বারা আমাদের নিজের সামাজিক নীতি পরিবর্ত্তনের আইন পাশ করান।

মহারাজার পরলোক গমনের সহিত সারদা আইনের একটা ভয়াবহ সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে বলিয়াই আমরা এতগুলি কথা বলিলাম। একজন বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদার যিনি হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ও হিতৈষী ছিলেন তাঁহাকে এই অপূর্ব্ব বিবাহ আইনের কল্যানে কিরূপ ভাবে আত্মবলি দিতে হইয়াছে তাহা ভাবিতেও দারুণ মর্ম্মপীড়া হয়।

সারদা আইনের প্রতিবাদে

তখনও সারদা আইন পাশ হয় নাই। তখনও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই আইন লইয়া দলাদলি এবং বাদানুবাদ চলিতেছে। সংস্কার প্রয়াসী ও সনাতনী দলের যুদ্ধ তুমুল ভাবে চলিতেছে। ভারতের বিশিষ্ঠ বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং

শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুনেতৃবর্গ বড়লাট সাহেবের নিকট ডেপুটেশন (Deputation) লইয়া গিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র এই আইনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে নানাপ্রকার সভা সমিতি এবং আন্দোলন চলিতেছে। সনাতনী এবং সংস্কারপ্রয়াসী দলেরা আপন আপন যুক্তির ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সাধারণকে স্ব স্ব পক্ষ আনয়ন করিবার জন্য তীব্র চেষ্টা করিতেছেন। এই সময় কলিকাতায় সনাতনী দলের চেষ্টায় এই বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের এক প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান করা হয় এবং মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবেন ঘোষণা করা হয়।

সংস্কার প্রয়াসী দলেরা এই ঘোষণার পর টাউন হলের সভার অধিবেশন নষ্ট করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বি, পি, সি, সির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসুর নামে ঐদিন আর একটি বিরুদ্ধ সভার অধিবেশন করার কথা প্রচার করেন। ঐ সভায় যে বিজ্ঞাপনী (Notice) বাহির করা হয় তাহা হইতেই বুঝা যায় যে টাউন হলের সভায় একটা বিপ্লব হইবে।

সনাতনী দলের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহোদয় অগ্রণী ছিলেন। এই উপলক্ষে নানা বিদেশ হইতে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দু পণ্ডিতগণও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সেই সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার দিন ঠিক সভার সময় সহসা দেখা গেল একদল হিন্দুস্থানী গুণ্ডা সভার কার্য্যে যোগদান করিবার ওজুহাতে তথায় আসিয়াছে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার সময় আরও দেখা গেল আমাদের দেশের হিন্দুধর্ম্মের তথা কথিত কয়েকজন নেতা শ্রীযুক্তা লতিকা বসু প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা নেত্রী সমভিব্যাহারে সভার স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। পণ্ডিত জহরলালও সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্যামসুন্দর সভার কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রস্তাব করিলে নানা দিক হইতে নানা প্রকার অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ আরম্ভ হয়। তাহার পর সভায় যে লজ্জাকর ঘটনা হয় তাহা প্রকাশ করিয়া জাতির কলঙ্ক প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া তাহার আর উল্লেখ করিলাম না। এই কলঙ্কের কাহিনী যত অপ্রকাশ থাকে বাঙ্গালীর পক্ষে ততই মঙ্গল।

যাহা হৌক কতকগুলি তথাকথিত সংস্কার প্রয়াসী উদ্ধত যুবকেরা উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া সভাপতির মর্য্যাদার কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান। যে পক্ককেশ, উন্নতমনা, ত্যাগী দানবীর নৈষ্ঠিক হিন্দু রাজর্ষি বাঙ্গলার শুধু বাঙ্গলার নহে সমগ্র ভারতের জন্য সর্ব্বস্ব হারা হইয়াছেন—জাতির মর্ম্মবেদনায় যাঁহার অবিরল নয়নাশ্রু প্রবাহিত হইত, সেই মহাপুরুষকে এতটুকু সম্মান করিবার মত শক্তি যে কাহারও ছিল না ইহা বড়ই অনুতাপের বিষয়!

আজ আমাদের বলিতে হইতেছে টাউন হলের সভায়

স্বজাতি কর্ত্তৃক এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়াতেই ক্ষোভে, দুঃখে সর্ব্বত্যাগী মহারাজ স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা আজি নির্ভীক ভাবে টাউন হলের সভাভঙ্গকারীদিগকে হত্যার জন্য দায়ী করিব। আমরা বলিব এই আত্মসর্ব্বস্ব একদেশদর্শী সমাজের নেতৃবর্গ—যাঁহারা নিজেদের কথাকেই বড় এবং গুরুতর বলিয়া মনে করেন এবং অন্য পক্ষের বক্তব্য শুনিতে চাহেন না অথবা অন্য পক্ষকে নিজেদের বক্তব্য বলিবার সুযোগ পর্য্যন্ত দেন না—ইঁহারাই মহারাজের মৃত্যুর জন্য দায়ী। আজ তাঁহারা নিজেদের যাহাই বলুন না কেন, কেহ কি আর তাঁহাদের কথা শুনিবে—কাহারও বিশ্বাস কি তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ?

বড় দুঃখ হয় এই ভয়ানক গর্হিত আচরণ করার পূর্ব্বে এই সমাজ সংস্কারকেরা কি একবারও চিন্তা করিতে পারেন নাই যে যিনি সেদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—সমাজের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া তিনি জাতির ধর্ম্মপথ ও কর্ম্মপথ নিয়ন্ত্রন করিতেছিলেন। দানে, ধ্যানে, গৌরবে, মহিমায়, ত্যাগে, বীর্য্যে, শিক্ষা দীক্ষায় ধর্ম্মে, কর্ম্মে সর্ব্ব বিষয়ে তিনি বাঙ্গালার আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার অমর্য্যাদা করা নিজেদের জাতির ঘোরতর অমর্য্যাদা করা নিজেদের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপন করা। মহারাজা আত্মত্যাগী মহাপুরুষ। এই অমর্য্যাদা দ্বারা তাঁহার সাধারণের চক্ষে তাঁহাকে হীন করিবার চেষ্টা করিলেও বস্তুতঃ তাঁহার

বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সময় বিগ্রহসহ মিছিল করিয়া
বহু সংকীর্ত্তনের দলসহ মহারাজ এই বেশে
নগর পরিক্রম করিতেন—



'গৌড়-রাজর্ষি' 'বৈষ্ণবচূড়ামণি' মণীন্দ্রচন্দ্র

গৌরব কেহ ম্লান করিতে পারে নাই। কিন্তু জাতির ও মানুষের এই অকৃতজ্ঞতায় মহারাজা মনে যে তীব্র বেদনা পাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। বড় দুঃখে বড় বেদনায় বলিতে ইচ্ছা হয়।

"Alas Ingratitude of Man"—

রোগশয্যায়।

টাউন হল সভার অব্যবহিত পরেই মহারাজা রাজধানী কাশিমবাজারে চলিয়া যান। কয়েকদিন কাশিমবাজারে বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়া যায়। শারদীয়া পূজার উৎসব কাশিমবাজার রাজবাটিতে মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। তখনও মহারাজার শরীর বেশ সুস্থ। কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে শত শত কাঙ্গালকে কাঁদাইয়া শত সহস্র আশ্রয়হীন উপায়হীন অনাথের কাতর রোদন উপেক্ষা করিয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, প্রিয়তম পৌত্র এবং প্রিয়তমা দৌহিত্রী সকলের মায়াপাশ ছেদন করিয়া বৈষ্ণব শিরোমণি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র গোলকধামে শ্রীবিষ্ণুর চরণ সমীপে মহাপ্রয়াণ করিবেন। কেহই ভাবিতে পারে নাই সেই সবল উদার ও তেজস্বী মহাপুরুষ মানুষের সঙ্গে সকল পার্থিব সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিয়া অমরাবতীতে চলিয়া যাইবেন।—এমন কি পীড়িতাবস্থায় যখন তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয় তখনও সকলে মনে করিয়াছিলেন যে তিনি আরোগ্য লাভ

করিয়া আবার কাশিমবাজার ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু হায়, কাহারও আশা পূর্ণ হয় নাই।

গত কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে তাঁহার সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। কয়েকদিন জ্বর ভোগের পর তিনি অত্যন্ত মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে থাকেন। এবং বোধ হয় তিনি সেই সময় মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার দেহত্যাগের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। তিনি এই সময় একবার কলিকাতায় আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বেই ২৭শে অক্টোবর তারিখে ৮৪ নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত "ভারতের সাধনা" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত এম,এ মহাশয়কে এক পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"আমি কলিকাতায় কবে যাইব তাহা বলিতে পারিতেছি না। ৺শারদীয়া পূজার সময় আমার জ্বর হইয়াছিল শারিরীক বল এখনও পাই নাই।"

নিয়তির নির্ম্মম বিধানে তিনি আর শারীরিক বল লাভ করিতে পারেন নাই। এই দুর্ব্বল শারীরিক অবস্থা হইতে তিনি ক্রমশঃ দুর্ব্বলতর অবস্থায় উপনীত হন।

জন্ম, মৃত্যু জরা ব্যাধি, শোক তাপ জগতের ইহাই অবিনশ্বর নিয়ম। রাজা প্রজা ভেদে সকলেই প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর নিয়মের বশীভূত। জরা মরণশীল মানবের জীবন লইয়া অনাদি কাল হইতে এইরূপেই নিয়তির কন্দুকক্রীড়া চলিতেছে—

"কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মরণ
ক্রমে ক্রমে ফলে কালে—
এই মানবের পরিণাম—
মৃত্যু ফেরে সাথে
নাহিক নির্ণয় কবে কার হরিবে চেতন।"

মানব দেহ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী অতি ভঙ্গুর—

"জলবিম্ব সম এ শরীর!
গৌরব ইহার কিবা?
অম্বুবিম্ব প্রায় নর উঠে,
অম্বুবিম্ব প্রায় পুনঃ টোটে।
মৃত্যু পাছে ফেরে লক্ষ্য নাহি কার।"

জীবনের এই নশ্বরতা, পার্থিব জগতে মানুষের এই ক্ষনস্থায়ী অবস্থান—এরই উপর বোধ হয় হিন্দুধর্ম্মের ত্যাগ মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত এই নশ্বরতা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয়ী মুণি ঋষিগণ ভারতের সাধনাকে ত্যাগের আদর্শে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছেন। বিলাসবাসনা পরিহার, ইন্দ্রিয় ও কামনা নিরোধ পূর্ব্বক সত্য, সুন্দর ও শিবের সন্ধান করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাই ভারতের বুকে শঙ্করাচার্য্যের বাণী জীমূতমন্দ্রে ধ্বনিত হইয়াছিল—

"নলিনী দলগত জলমতি তরলম্
তদ্বদ্‌জীবনমতিশয় চপলম্
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা"

তিনিই উদাত্ত কণ্ঠে মানবকে সাধনায় উদ্দীপিত করিতে গাহিয়াছন—

"দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ
শিশির বসন্তৌ পুনরায়তঃ
কালক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ু—"

অতএব হে মুক্তিকামীর দল, হে জরা মরণগ্রস্ত ঐহিক ক্ষণভঙ্গুরতার দাস মানুষ, হে নিয়তির নিষ্ঠুর লীলাখেলার কন্দুক, হে নর, হে ভঙ্গুর, হে নশ্বর—

"ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মুঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে
নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ করণে।"

৮ই নভেম্বর তারিখে মহারাজা তাঁহার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে তিনি কলিকাতার বাড়ীতে আসিবেন। সেই দিনই তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিন হইতেই তাঁহার কালব্যাধি প্রবলতর হয় এবং কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার সেইদিন হইতেই তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন।

মরজগতের নিত্য মরণশীল মানবের দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে বোধ হয় "বিধি লিপি অখণ্ডনীয়।"

কিন্তু এই মহাপুরুষের কথা চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান

হয় যে ধরণীর অনাচার, অবিচার ও কৃতঘ্নতায় তাঁহার পরমাত্মা স্বস্থানে চলিয়া যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই মর্ত্ত্যের বিষাক্ত বাতাসে যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু যেন তাঁহার অলক্ষিত স্নেহহাস্য দিয়া তাঁহার এই ভক্তশ্রেষ্ঠকে ধীরে ধীরে আপনার চরণতলে আহ্বান করিতেছিলেন। এ আকর্ষণ বড় তীব্র আকর্ষণ—মানুষের চেষ্টা এখানে ব্যর্থ, শক্তিহীন।

বিগত ১২ই নভেম্বর রাত্রি ১টা ২৩ মিনিটের সময় যখন মহারাজার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া কলিকাতা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরীকল্প চিকিৎসকগণ মহারাজার জীবন রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন তখন কোথায় বিষাদ মেঘাচ্ছন্ন কোন অন্ধকার আকাশের অন্ধকারের অন্তরালে কুটীলা নিয়তি একটুখানি মৃদু হাস্যের বিজলী চমকাইয়া তুলিলেন—সমবেত চিকিৎসক, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী পুত্র সকলের ব্যাকুল চেষ্টাকে তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া মহারাজার পুণ্য আত্মা বিদেহ মুক্তিলাভ করতঃ বৈকুণ্ঠে 'শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী' নারায়ণ,' 'ধৃত হিরণ্ময়-বপু' পদ্মাসন শ্রীবিষ্ণুর শ্যাম সুশীতল চরণ ছায়ার তলে চলিয়া গেলেন।

বাংলার পক্ষে এদিন কি দুর্দ্দৈবের দিন! বাংলার বুকের নিধি, বাঙ্গালীর মাথার মণি, ভারতের গৌরব কোহিনুর ভারত ছাড়িয়া বাংলা ছাড়িয়া, বাংলার অগণিত কাঙালকে আরও কাঙাল করিয়া বাংলার বুকে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দিয়া

বাঙ্গালীর রাজর্ষি অমরার পারিজাতোদ্যানে চলিয়া গেলেন। যেখানে গেলেন—সেখানে—

"মরণের ভয় নাই—
জরা সেথা শিশু যৌবন,
পুরাতন নাহি সেথা
নূতনের লীলা খেলা
জীবনের জনক মরণ।"—

যে আনন্দধামে তিনি চলিয়া গেলেন, সেখানে মরণশীল মানুষ নাই মানুষের স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ ও দলাদলি নাই—কোথাও এতটুকুও বৈষম্য নাই সেখানে হরবিলাস সারদা নাই বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন নাই—সেখানে জাতির জন্য সর্ব্বস্বহারা মহাপুরুষের উপর কেহ কৃতঘ্নতার তীক্ষ্ণ শানিত অস্ত্র নিক্ষেপ করে না। আজ তিনি সেই রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন—

"অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।"

অন্ত্যেষ্টির আয়োজন।

দুঃসংবাদ বাতাসেরও আগে ছড়াইয়া পড়ে। সেই স্তব্ধ অন্ধকার নিশীথে মহারাজার মহাপ্রয়াণে ধরণীর মর্ম্মবেদনা মর্ম্মরিত বায়ু হিল্লোলে সমস্ত কলিকাতা সহরে ছড়াইয়া পড়িল। সেই নৈশ অন্ধকারে, মধ্য রজনীর প্রগাঢ় ঘুমের আবরণ ছিন্ন করিয়া দলে দলে কাতারে কাতারে লোক সাকু্লার রোডে কাশিমবাজার ভবনে ছুটিতে লাগিল। সংবাদ পত্র প্রতিনিধিরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টির বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য মহারাজার

বাড়ীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে টেলিফোন করিয়া নানালোকে মহারাজার এই মহাপ্রস্থানের বিস্তৃত সংবাদ শুনিতে লাগিল। তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজবাটী জনাকীর্ণ হইয়া গেল। একদিকে সদ্য বিধবা মহারাণী, পিতৃহারা রাজকুমার ও রাজকন্যাগণের অরন্তুদ শোক অন্যদিকে অনুরাগী কর্ম্মচারিগণ এবং সহস্র সহস্র সমাগত গুণমুগ্ধগণের মর্ম্মান্তিক কাতরতায় রাজপ্রাসাদ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। কাহারও মুখে কথা নাই—সকলেই নীরবে এই বিরাট শোকে আকুলিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন।

অন্তর্জ্জলীর পর পবিত্র শবদেহ, মালাচন্দন ও তুলসী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া শ্রীহরির নামাঙ্কিত পবিত্র নামাবলী বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয় এবং অবিশ্রাম হরিনাম করা হইতে থাকে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এবং মৃত মহাত্মার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার শবদেহ কাশী মিত্রের ঘাটের যেখানে তাঁহার পিতা মাতার দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে সেইস্থানে দাহ করা স্থির হয় এবং প্রত্যূষে শবদেহ শোভাযাত্রা সহ কাশী মিত্রের ঘাটে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্মশানে শোভাযাত্রা।

পরদিন প্রত্যুষে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ, স্থানীয় জমিদার, সম্ভ্রান্ত লোক এবং আপামর সাধারণ সকলে একত্রিত হইয়া বিরাট মিছিল দ্বারা শবদেহ সহ শশ্মনাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। মিছিলের পুরোভাগে

জাতীয় পতাকা শোভিত হইয়া পরোলোকগত মহারাজাকে রাষ্ট্র নেতার যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়।

বাঙ্গালীর রাষ্ট্র স্বাধীনতার যে মূলমন্ত্র তাহা ১৯০৫ সনের আগষ্ট মাসে সর্ব্বপ্রথম মহারাজাই প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমানে তিনি শুধু রাষ্ট্রনেতা বলিয়া নহেন, জাতির মুক্তি পথের সন্ধানদাতা বলিয়া সকলের সম্মানিত হইবার যোগ্য।

লোকারণ্য শ্মশানভূমি

শবদেহ শ্মশানে নীত হইবার পর তথায় আরও অধিক লোক সমাগম হয়। বেলা এগারটার সময়ও শবদেহ চিতায় স্থাপিত করিয়া অগ্নিসংস্কার করা হয় নাই। তখন কাশী মিত্রের ঘাট লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। মাটীতে দাঁড়াইবার স্থান মাত্র না পাইয়া বহুলোক শ্মশানগৃহের ছাদে এবং নিকটস্থ গাছের ডালে উঠিয়া একবার মহারাজার পার্থিব দেহ শেষ দেখা দেখিয়া লইতেছে।

আজ পর্য্যন্ত দেশে অনেক মহাপুরুষ, অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা জন্মগ্রহণ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মত এমন গৌরব-ময় মৃত্যু কয় জনের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে; কত জনের মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া দেশ এমন হৃদয়ভেদী বিলাপ করিয়াছে? আর কত জনের মৃত্যুতেই বা দেশের এমন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। জগতের কেহ স্বীকার করুক বা নাই করুক—তাহাতে কিছুমাত্র

আসিয়া যায় না কিন্তু মরণের এই জয়যাত্রা, শত শত সহস্র সহস্র নয়নের তপ্ত অশ্রুজলের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত—তাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া ইতিহাসের বুকে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে, ভবিষ্যতে ধৈর্য্যহারা, বাঁধনহারা শোকার্ত্ত সন্তানদিগকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা দিবে। ভগবানের রাজ্যে এই এক নিয়ম যে 'যাঁহারা পুণ্যকর্ম্ম করিবেন, যাঁহারা লোকহিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন—যাঁহারা প্রীতির অনুরোধে নিজের মুখের গ্রাস পরের মুখে তুলিয়া দিবেন—তাঁহারা প্রদীপ্ত নক্ষত্ররাজির ন্যায় ইতিহাসের গগন পথে চিরদিন উদিত থাকিয়া ভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইবেন।

বেলা এগারটার পর শবদেহের গঙ্গাস্নান, নববস্ত্র পরিধান তিলকাদি প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী অন্ত্যেষ্টি কৃত্যাদি সম্পন্ন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ গব্যঘৃত দ্বারা অভিসিক্ত চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর শবদেহ স্থাপন পূর্ব্বক যথারীতি অগ্নিসংযোগ করা হয়। দাউ দাউ করিয়া চিতানল জ্বলিয়া উঠিয়া তাহার ধূম ও অনল-শিখা আকাশস্পর্শ করিল। চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া উচ্চ হরিধ্বনি উঠিল। তারপর ক্রমে ক্রমে সব ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এই শ্মশান, এই চিতাগ্নি—ঐ ধূমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহ বিলীন হইয়া গেল—ঐ ধূমের সঙ্গে সঙ্গে সকল মতবাদ, সকল জাতিগত, নীতিগত বৈষম্য সকল বিবাদ, সকল ক্ষোভ এক হইয়া মানুষের মধ্যে সাম্যের এক নূতন বারাণসীর সৃষ্টি হইল—আজ এই সময় এইখানে—

"কোরাণ পুরাণ এক হয়ে গেছে
বাজে মৈত্রীর বাঁশী
কাশী এসে যেন সহসা দাঁড়ালো
মক্কার পাশাপাশি"—

এ মহাতীর্থ যুগে যুগে মানবের চিত্তের এই পুণ্যতীর্থে এখানে—

"চিত্ত তীর্থ এই ত হেথায়—
দেবতা মানব এক হয়ে যায়—
প্রাণের দেউল সদা মশগুল
প্রেমধূপ গুগ্‌গুলে—"

পৃথিবীর সকল স্থানের মধ্যে এই স্থানই সত্য, এই স্থানই সুন্দর, এখানেই যত দুঃখ, যত আনন্দ। মানবের এই মহাতীর্থে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের পরিবেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া অন্তরকে আহ্বান করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে,
এই জগতের মহামানবের সাগর তীরে।"

সব শেষ হইয়া গেল। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পার্থিব নশ্বর দেহ অগ্নিস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া গেল—তাহার পার্থিব দান, ধ্যান; জপ যজ্ঞ শেষ হইয়া গেল—মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—তাঁহার দেহ আজ শ্মশানের ধূলিকণায় পরিণত হইয়া আকুল গতিময়ী তরঙ্গিনী ত্রিভুবনতারিণী জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে ভাসিয়া গেল।

কিন্তু সত্যই কি মণীন্দ্রচন্দ্র গিয়াছেন? না—না মহা-পুরুষের তিরোধান মৃত্যু নহে—এ মহারাজা আছেন ভারতের প্রতি অনু পরমানুতে তিনি আজ বিদ্যমান—এ তাঁহার মৃত্যু নহে—এ যেন তাঁহার জীবনের প্রসার—শুধু কায়ার পরিবর্ত্তন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি—
শরীরানি জীর্ণানি তথা বিহায়
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

তিনি কায়ার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র। নতুবা তিনি আছেন আমাদের হইয়া আমাদেরই মধ্যে, তিনি আছেন, যুগ যুগান্ত ধরিয়া আমাদেরই থাকিবেন। কেন না—"যাঁহারা শক্তির প্রসাদাৎ কিংবা সাধনার বলে আপনার জীবনকে বহু জীবনের সহিত মিশাইয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা জীবনের অমৃত বিলাইয়া কিংবা আলেখ্য দেখাইয়া মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপরে তুলিয়াছেন, তাঁহারা সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও আমাদিগের মধ্যে সতত উপস্থিত। পৃথিবী তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যার পদ্মাসন,—শ্মশান তাঁহাদিগের স্বর্গারোহনের সোপান মঞ্চ।" *

সত্যই, হে মণীন্দ্রচন্দ্র, হে মানবের কল্যাণ ব্রতধারী মহাপুরুষ, মর্ত্তে ভগবানের অনুগ্রহরূপে তুমি অবতীর্ণ হইয়াছিলে জগতে তুমিই সত্য সাধনা দ্বারা ভগবানকে লাভ করিয়াছিলে,

* স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ, "ঐহিক অমরতা,"

প্রকৃত আত্মত্যাগ দ্বারা তুমিই মানবকে জয় করিতে পারিয়াছিলে, তুমি ঋষি, মানবের মুক্তির সন্ধানদাতা—জগতে তোমার মৃত্যু নাই, তোমার ক্ষয় নাই—তুমি অমর, তুমি চির নবীন তুমি চির সুন্দর—

"সাধু শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক,
তুমিই বুঝিলে সার জীবের সাধন
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতী তলে
চির মোক্ষ ফলপ্রদ নিত্য হিতকর।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার,
জীবকুল সাধন কল্যাণ অনুদিন!
পরহিত ব্রত ঋষি ধর্ম্ম যে পরম
তুমিই বুঝিয়াছিলে—"

হে সাত্ত্বিক, হে স্বার্থত্যাগী নররূপী দেবতা তোমার উদ্দেশে জাতির কোটি নমস্কার—তোমার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে তোমার জাতির শত শত সহস্র সহস্র প্রণাম—

"—সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে।"

তোমার জন্মে তোমার জাতি ও দেশ ধন্য হইয়াছিল ॥



শোকাচ্ছন্ন দেশ

তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদে দেশীয় নেতৃবর্গ ত তাঁহার প্রাসাদে পস্থিত হইয়া শোকাতুর আত্মীয়বর্গকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেনই পরন্তু স্থানীয় স্কুল কলেজ ও বহু অফিস তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শোকপ্রকাশ ও সম্মানপ্রদর্শন করিবার জন্য বন্ধ ছিল।

কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত জে, এম, সেন গুপ্ত, স্যর দেবপ্রসাদ প্রভৃতি সকলে কাশিমবাজার রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং শোকার্ত্ত পরিবারকে এই দারুণ শোকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের গভর্ণর মাননীয় স্যর ষ্টান্‌লী জ্যাকসন মহোদয়ের সেক্রেটারী শোক জ্ঞাপন করিয়া মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নিকট এক গভীর সহানুভূতিপূর্ণ পত্র দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন নানাস্থান হইতে মহারাজ কুমারের নিকট এত শোক ও সান্ত্বনাজ্ঞাপক পত্রাদি আসে, ব্যক্তিগতভাবে সকলগুলির উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া মহারাজকুমার সংবাদপত্রের সাহায্যে সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

টাউনহলে শোকসভা

তাহার পুণ্য স্মৃতিকে সম্মান করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার জনগণ একত্রিত হইয়া কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট শোক

সভার অনুষ্ঠান করেন। সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহোদয় তাহাতে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সভায় সমবেত নেতৃবর্গ ও অপরাপর জনসাধারণ শোকরুদ্ধ কণ্ঠে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মহারাজার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া শোক প্রকাশ করেন।

স্বয়ং সভাপতি মহাশয় গভীর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মহারাজার অশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

রাজনৈতিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় মহারাজের অতুল দানকীর্ত্তির সমালোচনা করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে জাতির অকল্যাণ হইল বলিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকসভা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার অধিবেশন কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চেন্সেলর ডাক্তার আর্কুহার্ট কাশিম বাজারের মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব পেশ করেন তিনি বলেন, মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার উৎসাহ অপরিসীম ছিল। তাঁহাব প্রতি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতজ্ঞ থাকিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটহাউসে তাঁহার এক প্রতিকৃতি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নরূপে স্থাপিত করিয়াছেন।

প্রস্তাবটি সকলে শ্রদ্ধার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে শোক সভা

মহারাজার স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি সভা স্থগিত থাকে, এবং এক বিশেষ শোক সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হয়।

"That the Corporation expresses its sincerest condolence to his son Maharaj Kumar Sris Chandra Nandi and other members of his family in their sad bereavement and that as a mark of respect to the memory of the deceased the business of the Corporation be adjourned till Friday next. The Maharaja's name was indeed one to conjure with in the public life of Bengal. He gave up his best for the advancement of various causes of public utility and usefulness. He was a firm believer in the truth that there is no religion higher than the service of charity and he spent a large portion of his colossal fortune in relieving the distress of the poor and the needy."

এই প্রস্তাব আনয়ন কালে কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজার অশেষ গুণাবলী উল্লেখ করিয়া এক বক্তৃতা দেন। দেশীয় খ্রীষ্টানগণের পক্ষ হইতে রেভারেণ্ড বি, এ, নাগ মহোদয় মহারাজার গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

কলিকাতার মেয়র মহারাজার নানা বিষয়িনী প্রতিভা ও নানা সদ্‌গুণের আলোচনা করিয়া এক গভীর মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দান করার পর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

এইরূপ প্রায় সকল স্থানেই মহারাজার স্মৃতিকে সম্মান করিয়া শোক প্রকাশ করা হয়। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটীর নাম উল্লেখ করিলাম।

গৌরীপুরে, নবদ্বীপ কংগ্রেস কমিটীতে, নবদ্বীপ সাহিত্য-রঞ্জনী সভায়, জিয়াগঞ্জে, নারায়ণগঞ্জে; বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর বিহারে, নড়াইলে, বোলপুরে গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজে, মাগুড়া উকীল সভায়, বহরমপুর জেলা কংগ্রেস কমিটীতে, চুণ্টায়, শ্রীশ্রীপুরীধামে ও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র।

মহারাজা দেশের যুবকগণের জন্য কেমন ভাবিতেন তাহা তাঁহার লিখিত "যৌবনের আদর্শ" হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"আমাদের দেশে যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা শঙ্কাজনক সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া আমরা কি নির্জ্জিব হইয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব ? আমাদের দেশ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে উদ্যমবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল যুবকদিগের মধ্যে উন্নতির ইচ্ছা আছে, শিক্ষা ও অর্থের অভাবে তাহারা সে উন্নতির পথে যাইতে পারিতেছে না। স্কুল কলেজের শিক্ষার সহিত সাধারণতঃ আমাদের শিক্ষা শেষ হইল, আমরা এই জ্ঞান লইয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করি এবং নিজ মতামত প্রকাশ করি, ইহাতে উন্নতির আশা কোথায় ?"

"মৌলিক চিন্তার অধিকারী হওয়া একান্ত দরকার। বর্ত্তমান সময়ে যুবকবর্গ যেরূপভাবে শিক্ষিত হইতেছেন তাহাতে জাতীয় জীবন গঠিত হয় না এবং জাতীর স্বাধিনতা পাওয়াও তাহাতে সুকঠিন। সেজন্য আমাদের প্রয়োজন গঠনমূলক কার্য্য।"

"বর্ত্তমান সময়ে কারখানার শ্রমিক ও অন্যান্য কুলী মজুরদের আর্থিক অবস্থার হয়ত কিছু উন্নতি হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে দৈন্য ঘুচিতেছে না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার বিশেষ আবশ্যক।"

"সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, পুস্তকালয় স্থাপন, কৃষির উন্নতির জন্য এক একটি কেন্দ্রে Loboratory স্থাপন বিশেষ আবশ্যক। স্ত্রী শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠাগার স্থাপন, শ্রমজীবীগণের জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের জন্য Research Laboratory, Applied Chemistryর Laboratory স্থাপনের প্রয়োজন।"

"সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার না করিতে পারিলে ভারতের যুবকগণের কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না। অজ্ঞতাই দাসত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার শোষণ-নীতির সহায়।"

—

রবীন্দ্রনাথের চিঠী

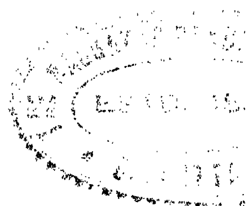
শান্তিনিকেতন

পরলোকগত উদার চরিত্র মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যথেষ্ট সুযোগ ঘটেনি। লোকহিত ব্যাপারে তাঁর অকুণ্ঠিত দাক্ষিণ্যের সংবাদ সকলেই জানে, আমিও জানি। প্রত্যক্ষভাবে আমি তাঁর একটি পরিচয়ও পেয়েছি। শান্তিনিকেতন আশ্রমের পণ্ডিত হরিচরণ বিদ্যারত্ন দীর্ঘকাল একান্ত অধ্যবসায়ে বাংলা অভিধান সঙ্কলনে প্রবৃত্ত। এই কার্য্যে যাতে তিনি নিশ্চিন্ত মনে যথোচিত সময় দিতে পারেন সেই উদ্দেশে মহারাজ তাঁকে বহুবৎসর যাবৎ মাসিক অর্থ সাহায্য করে এসেচেন। এই কার্য্যের মূল্য তিনি বুঝেছিলেন এবং এর মূল্য দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। লক্ষ্মীর প্রসাদ তিনি পেয়েছিলেন,—সেই প্রসাদ অজস্র বিতরণ করবার দুর্লভ শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর সেই ভোগাশক্তিবিমুখ ভগবৎপরায়ণ নিরভিমান মহদাশয়তা বাঙালীর গৌরবের কারণ রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(উপাসনা হইতে গৃহীত)



বাংলা গভর্ণরের সমবেদনা সূচক পত্র

(মূল পত্রের অনুবাদ)

গভর্ণমেণ্ট হাউস, কলিকাতা

১৪ই নভেম্বর ১৯২৯

প্রিয় মহারাজকুমার !

আপনার পিতৃবিয়োগ সংবাদে আমি যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছি। মহারাজার বন্ধুত্বকে আমি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করিতাম এবং তাঁহার প্রতি আমার মহান্ শ্রদ্ধা ছিল। স্বদেশের সেবাই মহারাজার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাইল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহার অসংখ্য দানের কথা কখনই বিস্মৃত হইবার নহে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সহৃদয় বদান্যতার কথা অসংখ্য দিকে বহু উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আমার ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনীয়।

একান্তই আপনার

(স্বাঃ) এফ, ষ্ট্যানলী জ্যাকসন্

মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

[শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ]

প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে বাঙ্গালার দানবীর—নব্য বঙ্গের শ্রেষ্ঠ দাতা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু বাঙ্গালীর পক্ষে অকাল মৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার দিকে দিকে যে শোকোচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছে, তাহা অকাল মৃত্যু ব্যতীত অন্য কারণে সম্ভব হয় না। তাঁহার মৃত্যু বাঙ্গালার কাছে অকাল মৃত্যু বলিয়াই বিবেচিত হইবে ; কেন না, সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁহার স্থান অধিকার করা ত পরের কথা, তাঁহার আসন সন্নিকটে উপনীত হইবার কেহও নাই। বাঙ্গালা যে দিকপাল হারাইয়াছে, তাঁহার স্থান বুঝি চিরদিনই শূন্য থাকিয়া যাইবে। কেন না, তিনি দেশের সকল সৎকার্য্যে, উন্নতিকর কার্য্যে দানের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন অভিনব তেমনি অতুলনীয়। তিনি দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই ; তিনি যখন মাতামহের সম্পত্তি লাভ করেন, তখন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ৩২ বৎসরকাল তিনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ধনিগণের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তিনি চিরদিনই দরিদ্র ; কেন না, তিনি কখন দান-কুণ্ঠ ছিলেন না। তাঁহার আয় যত অধিকই কেন হউক না, তাঁহার দান তাঁহাকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় তাঁহার সম্পত্তির অপেক্ষা বহুগুণে বিস্তৃত ছিল।

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক যখন গত ৩২ বৎসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উপকরণ পরীক্ষা করিবেন, তখন তিনি মনীন্দ্রচন্দ্রের বিরাটত্বে অভিভূত হইয়া পড়িবেন ; তিনি দেখিবেন, এই দীর্ঘকাল মধ্যে বাঙ্গালার এমন কোন লোকহিতকর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্য প্রদত্ত হয় নাই। কি রাজনীতিক্ষেত্রে,

কি অর্থনীতিক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, কি কর্ম্মের ক্ষেত্রে তাঁহার মহত্ত্ব সর্ব্বত্র সপ্রকাশ ছিল। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রেই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহার কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, যেমন অসার কাষ্ঠখণ্ডে মূর্ত্তি ক্ষোদিত করা যায় না, তেমনই অশিক্ষিত সমাজে কোনরূপ উন্নতি স্থায়ী হয় না—হইতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, তাঁহার দানের পারিমাণ ১ কোটি টাকা এবং দানের জন্য প্রসিদ্ধ পার্শী সম্প্রদায়ের কেহই একক এত টাকা দান করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন—বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে শিক্ষাবিস্তার কল্পেই তিনি ন্যূনাধিক কোটী টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন বাঙ্গালার আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান গবেষণা মন্দিরে তেমনি তিনি ২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র কয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিনি বহরমপুরে একটি চিকিৎসা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও ১ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ তাঁহার অপর কীর্ত্তি। উহার জন্য কখন কখন তাঁহাকে বৎসরে ৫০ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় করিতে হইয়াছে। কলেজ স্কুলটির নির্ম্মাণ কল্পেই তিনি প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। নানা স্থানে তিনি মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সে সকলের ব্যয়ভার বহন করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শতাধিক ছাত্রকে বাস ও আহার দিয়া প্রতিপালন করিতেন এবং তাহাদিগের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। বহু ছাত্র তাঁহার নিকট পাঠ্য পুস্তকের ও পরীক্ষার ফীর জন্য অর্থ পাইত। আবার তিনি ইথোরায় খনির কাজ শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন এবং রাঁচীতে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। যখন শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার এই কার্য্য স্মরণ করা যায়, তখন মনে হয় তিনি ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষাবিস্তারের সহায় হয়েন নাই—পরন্তু স্বয়ং একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান ছিলেন। গোমুখীর মুখ হইতে জাহ্নবীর ধারা প্রবাহিত হইয়া যেমন সমগ্র দেশকে উর্ব্বর ও পবিত্র করে, তাঁহার দয়া হইতে প্রবাহিত সাহায্যধারা তেমনই সমগ্র বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্য করিত। কোন দেশে—কোনকালে এমন দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই অসাধারণ কীর্ত্তির সম্মুখে ইতিহাস যেন স্তম্ভিত—শ্রদ্ধায় অবনত—নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়ায়। সমগ্র জগতে এই কীর্ত্তির তুলনা মিলে না।

দেশের লোককে শিক্ষিত করা যেমন মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করিয়া দেশের লোককে দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে সাহায্য করাও তেমনই তাঁহার ঈপ্সিত ছিল। সে জন্য তিনি যথেষ্ট ক্ষতি অকাতরে সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু শিক্ষার্থীকে বিলাতে, জাপানে, মার্কিনে, জার্ম্মানীতে পাঠাইয়া শিল্প কৌশল অবগত করাইয়াছিলেন। বেঙ্গল পটারিজ্, রাজ্‌গাঁ পাথরের কারখানা, চায়না ক্লের কারখানা, বহরমপুর ট্যান্যারী, তেলের কল, দেশলাইয়ের কল এসব তাঁহারই উদ্যোগে ও সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার বিপুল সম্পত্তি দেশের কল্যাণ সাধন জন্য ন্যাস বলিয়া বিবেচনা না করিতেন, তবে কখনই তাঁহার দ্বারা এই সব কার্য্য সম্পাদন সম্ভব হইত না। কেন না, বিষয়ীর দিক হইতে দেখিলে তাঁহার দান ও ত্যাগ যে মহত্ত্বের পরিচায়ক তাহার অনুশীলন দেবোচিত হইলেও সংসারী মানবের পক্ষে সমীচীন নহে। একবার তিনি তাঁহার কোন ধনী বন্ধুর সহিত দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করিতেছিলেন।

তিনি বন্ধুকে শিল্প প্রতিষ্ঠায় অবহিত হইতে অনুরোধ করিলে বন্ধু যখন শিল্প প্রতিষ্ঠায় লোকসানের সম্ভাবনার উল্লেখ করিলেন, মহারাজা তখন বলিলেন, "আমিও ত অনেক লোকশান দিয়াছি; কিন্তু সেই জন্ম যদি আমরা অগ্রণী না হই, তবে দেশে কিরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে—অন্য লোক কিরূপে সাহস পাইবে?" অর্থাৎ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য যে ব্যয় অনিবার্য্য তাহা ধনীরাই বহন করিবেন। তিনি দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহশীল ছিলেন বলিয়াই কলিকাতায় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রথম যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে তাহার উদ্বোধন করিবার কার্য্যে বৃত করিয়াছিলেন।

তাঁহার সাহিত্যানুরাগের নিদর্শন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির। পরিষদ যখন স্থাপিত হয় তখন শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের গৃহে তাহার আশ্রয় মিলিয়াছিল। তাহার পর ব্যক্তিবিশেষের গৃহে এইরূপ প্রতিষ্ঠান না থাকাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করা হয় ভাড়া বাড়ীতে—শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থানে—পরিষদকে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার গৃহ নির্ম্মাণ কল্পনা হয়। যখন আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত, সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্যরসিক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কবিবর শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোবিদ শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় প্রভৃতি তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত তখন চারুচন্দ্র ঘোষ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে পরিষদের পক্ষ হইতে কয়জন কাশিমবাজারে গমন করেন। তাঁহাদিগের প্রস্তাব শুনিয়াই মহারাজা সানন্দে পরিষদ মন্দিরের জন্য আবশ্যক জমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। পরিষদকে মণীন্দ্রচন্দ্রের দান ইহাতেই শেষ হয় নাই। ইহার পর যখন পরিষদের

প্রসারবৃদ্ধি হয়, তখনও রমেশ ভবনের জন্য তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন। আজিকে যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, মণীন্দ্রচন্দ্রই তাহার স্রষ্টা। তিনিই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বৎসর বৎসর বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগকে এক কেন্দ্রে সম্মিলিত করিবার কল্পনাকে মূর্ত্তি দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কাশিমবাজার রাজ বাড়ীতে সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। পরবর্ত্তী কয়টি অধিবেশনেও তিনি উপস্থিত এবং একবার অধিবেশনে হোতার কাজও করিয়াছিলেন।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের রাজনৈতিক কার্য্যের কথা বিস্মৃত হইলে বাঙ্গালীর ললাটে কৃতঘ্নতার অনপনেয় কলঙ্ক চিহ্ন চিহ্নিত হইবে। সকল দেশের—বিশেষ বিজিত দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল মন্ত্র—"আগে চল, আগে চল ভাই।" যে কংগ্রেস আজ স্বাধিনতাই আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে সেই কংগ্রেস কি উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলেই এই কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। সেই জন্যই ম্যাটসিনীর শিষ্য সুরেন্দ্রনাথও শেষে তরুণদের নিকট অগ্রগামী নহেন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে নেতৃত্বের আসন দানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলে, তাঁহারা সুরেন্দ্র নাথেরই রচিত বেদীর উপর দণ্ডায়মান ছিলেন। তেমনই বাঙ্গালার সঙ্কট সময়ে মণীন্দ্রচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালার রাজনৈতিক উন্নতির ইতিহাসে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তখন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। লর্ড কার্জ্জনের বিধানে বাঙ্গালার জনমতের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত হইবে। একদিকে গুণ্ডার লাঠি ও বন্দুক বেয়নেটে শক্তিশালী রাজপুরুষদিগের জিদ্, আর একদিকে অহিংস

অসহযোগে দৃঢ়সঙ্কল্প বাঙ্গালার জনগণ। বাঙ্গালার জনমত যে পরাভব জানে না, লর্ড কার্জ্জন হইতে সার ব্যাম ফাইল্ড ফুলার পর্য্যন্ত শাসকরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই তখন রাজনৈতিক গগনে ঘনঘটা পুঞ্জীভূত মেঘমধ্যে রাজরোষ বজ্রদ্যোতক বিদ্যুতের মত দেখা দিতেছে। বাঙ্গালী প্রতিজ্ঞা করিল—বঙ্গভঙ্গ নাকচ করিবে। সে যুদ্ধের প্রথম তুর্য্যনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল—মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দ্বারা। সে যেন পাঞ্চজন্ত শঙ্খের ধ্বনি। যে সভায় বিলাতীপণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে সভায় তিনিই সভাপতি ছিলেন। বাঙ্গালীর জয়রথ তাঁহার সারথ্যে কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আজ আর বলিয়া দিতে হইবে না। যিনি স্বয়ং সরকারের উপাধিধারী, যিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী—তিনি তাঁহার এই কার্য্যের দ্বারা যে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কি স্বদেশপ্রেমের উৎস ব্যতীত আর কোথাও উদ্গত হইতে দেখা যায় ?

ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যরূপে তিনি সমভাবে দেশের লোকের অধিকার সঙ্কোচক বিধির প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ভাবে রৌলট আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা আমি কখন বিস্মৃত হইব না। সে দিনের দৃশ্য ভুলিবার নহে। লর্ড চেমসফোর্ড সেই দিনই আইন পাশ করিবেন। পূর্ব্বাহ্নে একবার, অপরাহ্নে আর একবার এবং সন্ধ্যায় তৃতীয় বার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে; তাহার পর দিল্লীর শীতে রাত্রির অধিবেশন। জয়লাভ অসম্ভব বুঝিয়া বীরযোদ্ধা স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আর শেষ অধিবেশনে আসিলেন না। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মণীন্দ্রচন্দ্র রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত থাকিয়া আইনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া—বাঙ্গালীর প্রতিনিধির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরিলেন। দেশপ্রীতি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সেরূপ দৃষ্টান্ত কয় জন দেখাইতে পারেন!

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করায় সরকার দশ বৎসর মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু তিনি ভীত হয়েন নাই। দেশের লোকের কল্যাণের জন্য তিনি আপনি ঋণ করিয়াও দান করিয়াছিলেন। যাঁহারা আজ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে প্রজাপক্ষ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতেছেন, তাঁহারা যদি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া প্রজাকে জমা হস্তান্তর করিবার প্রস্তাবের আলোচনা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, স্বয়ং জমীদার হইয়াও প্রজাকে সে অধিকার প্রদান করিবার ও জমীদারের সেলামী সঙ্কোচ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার বহুদিন পরে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে প্রায় তাঁহার মতই গৃহীত হইয়াছে। দেশের লোকের পক্ষ ত্যাগ করিয়া সরকার পক্ষ গ্রহণ করিলে তিনি ৭০ বৎসর বয়সে কেবল "মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই" থাকিতেন না। পরন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক উপাধির ভার তাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হইত।

মণীন্দ্রচন্দ্রের ধর্ম্মমত অসাধারণ উদার ছিল। তিনি যে মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, সেই মাতামহের বংশ বৈষ্ণব-মতাবলম্বী। তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব মতের প্রচার কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি জানিতেন—"অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত বীর।" তাঁহার কাছে শুনিয়াছি, তাঁহার মাতামহ বংশ এমন গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন যে, শৈব বা শাক্তমত সহ্য করিতে পারিতেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বৃন্দাবন যাত্রাকালে আদেশ দিয়াছিলেন, নৌকার প্রহরীরা দূর হইতে কাশীর "বেণীমাধবের ধ্বজা" দেখিতে পাইলেই যেন তাঁহার কক্ষের পর্দ্দা ফেলিয়া দেয়—তিনি কাশী দেখিবেন না, আর মহারাজা কলিকাতায় বৌদ্ধদিগের বিহার নির্ম্মাণ জন্য ভূমিখণ্ড দান করিয়াছিলেন।

তবে তিনি স্বয়ং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্য তিনি

সযত্নে সম্পন্ন করিতেন এবং হিন্দুর আচার ও ব্যবহারের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। সেই জন্যই তিনি বিদেশী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্ট ব্যবস্থাপক সভার আইনের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন। সেজন্য যে মুষ্টিমেয় লোক তাঁহাকে সঙ্কীর্ণতার অপবাদ দিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যের স্বরূপ দেখিতে পায় নাই। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাঁহারই অর্থে বহু বাঙ্গালী যুবক দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প শিখিবার জন্য বিলাতে, জার্ম্মাণীতে, জাপানে গিয়াছিল। তাঁহার সাহায্যে কোন বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞ বিদেশে সঙ্গীতচর্চ্চার জন্যও গমন করিয়াছিলেন। অনেকে হয় ত জানেন না, এ দেশে যেমন শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রভৃতি তাঁহার অর্থ সাহায্যে সাহিত্যিক কার্য্য করিয়াছিলেন, বিদেশে তেমনই ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যাল তাঁহারই অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। এ দেশে সমাজপতিরাই লোকমত লইয়া সমাজ-সংস্কার করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সেই মতাবলম্বী ছিলেন। সেও তাঁহার জাতীয়তার পরিচায়ক। তিনি জানিতেন, জাতি যখন শিক্ষিত হয়, তখন আবশ্যক সংস্কার স্বতঃই সংসাধিত হয়। তিনি জাতীকে শিক্ষিত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; সেজন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা কেবল বঙ্গদেশে—কেবল ভারতবর্ষে কেন—যে কোন দেশে বিরল। শিক্ষা যাহাতে জাতীয় ভাব-ধারার বিরোধী না হয়, সেই জন্য তিনি জাতীয় পরিষদের পুষ্টিকল্পে দান করিয়াছিলেন; আর সেই জন্যই তিনি স্বয়ং ছাত্রদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

তিনি যে তাঁহার সম্পত্তি ন্যাসরূপে ব্যবহার করিতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার আড়ম্বরহীন, বিলাসবর্জ্জিত জীবন-

যাত্রা-রীতিতেই তাহা বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জন্ত এত অল্প ব্যয় করিতেন এবং তাঁহার পরের জন্ত ব্যয়ের তুলনায় তাহা কিরূপ নগণ্য তাহা বিবেচনা করিলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয় এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

মানুষের—বিশেষ তাঁহার স্বদেশবাসীর সেবাই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। সে সেবা তিনি কিরূপ নিষ্ঠা সহকারে—কিরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে—কিরূপ আনন্দে করিয়া গিয়াছেন তাহা আজ তাঁহার অভাব তাঁহার দেশবাসীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। তিনি দেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে কিরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি দেশের দারিদ্র্যে ব্যথিত হইয়া কিরূপে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন সে কথাও বলিয়াছি। তিনি দেশবাসীর রাজনীতিক অধিকার বিস্তারে কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন, তাহাও দেখাইয়াছি। তিনি কিরূপে দয়ার প্রবাহে বিষয় বুদ্ধি ভাসাইয়া দিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দেশের ব্যথিত—পীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখেও তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। বহরমপুরে জলের কলের বিস্তার সাধন করিয়া সুপেয় বারি প্রদান জন্ত তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; তিনি বহরমপুরে চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত যখন লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে নানাদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল; তিনি বহরমপুরে একটি হাঁসপাতাল পরিচালিত করিতেন; তিনি নানাস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেন; তিনি কলিকাতায় বেলগাছিয়ার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্ত অর্থ দান করিয়াছিলেন; জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদও তাঁহার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয় নাই। এ সকলই তাঁহার জনসেবার নিদর্শন।

বাঙ্গালা যে জনহিতকর অনুষ্ঠানে দানের জন্ত ভারতের প্রদেশসমূহের

মধ্যে অগ্রণী ছিল সে কেবল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জন্য। তিনি একাধারে সমুদ্রের উদারতা ও দধীচির ত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি এদেশে দানের নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার দান কোন সম্প্রদায়ে, কোন স্থানে, কোন অনুষ্ঠানে বদ্ধ ছিল না—তাঁহার উদারতাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই জন্যই বাঙ্গালী পরিণত বয়সে তাঁহার তিরোভাবকেও অকালমৃত্যু বলিয়া মনে করিতেছে এবং করিতে থাকিবে।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের মত বহুগুণশালী বাঙ্গালীর অভাব যে কখন বাঙ্গালার সামাজিক জীবনে পূর্ণ হইবে, এমন আশা করা যায় না। কেন না সেরূপ গুণসংযোগ সচরাচর হয় না।

আজ তিনি আর নাই। যিনি দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল বঙ্গদেশে বিপন্নের আশ্রয় ও সকল সৎকার্য্যে সহায় ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার গৌরবগিরির স্বর্ণচূড়ারূপে চিরদিন বাঙ্গালীর স্মৃতিতে বিরাজিত থাকিবেন। তাঁহার দান পুণ্য প্রবাহিনী ধারায় অবগাহন করিয়া বাঙ্গালী আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিবে এবং যত দিন যাইবে ততই তাঁহার কীর্ত্তি উদয়াস্ত-অরুণ-রাগ-রঞ্জিত হিমাচল শৃঙ্গের মত বাঙ্গালীকে মহত্ত্বের স্বরূপ দেখাইয়া মনুষ্যত্বের দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করিবার আদর্শে আকৃষ্ট করিবে।

আজ তাঁহার জন্য শোকার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহার সম্বন্ধীয় এই আলোচনা শেষ করিবার সময় মনে হইতেছে—

মহত্ত্ব গোমুখী মুখে করি' প্রবাহিত—
দয়ার পাবনী ধারা ; করি' প্রতিষ্ঠিত—
দানের আদর্শ নব ; লভিলে আশ্রয়,
পূর্ণব্রত, অমরায়—তুমি মৃত্যুঞ্জয়।

(উপাসনা হইতে গৃহীত)

হরিদ্বারের পথে।

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

রাত্রি ১১টার সময় মহারাজকুমার টেলিফোন করিলেন—"তুমি মহারাজার সঙ্গে হরিদ্বারে যেতে পারবে? তিনি জটিলা ও বেণীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন—তুমিও যদি সঙ্গে যাও অনেক বিষয় আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব। তোমার কোন ভয় নাই, হেমন্তদাও (হেমন্তদাও আজ এই সংসারে নাই, হরিদ্বার যাত্রার সঙ্গী, বয়সে বড় হ'লেও আহারে বিহারে সঙ্গী স্নেহময় হেমন্তদা, আজ নাই!) সঙ্গে যাবেন। বাবার ইচ্ছা তুমি সঙ্গে যাও।"

মাস দু'য়েক হ'ল বহরমপুর থেকে চলে এসেছি, Nervous অসুখ নিয়ে মনের কোনে একটু দ্বিধাও জাগল—নিজের অসুস্থতা, পাছে বা আর সকলকে বিব্রত করি, কিন্তু "মহারাজের ইচ্ছা"—তার বাড়া ত আর কথা নাই। তা'ছাড়া সুদূর যাত্রার প্রলোভনটাও কম নয়। তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম প্রস্তুত—"কাল সকালে মহারাজার সহিত দেখা কর্‌ব।"

সকালে মহারাজার সহিত দেখা করতে যেতেই—হাসিমুখে বল্‌লেন,—"কি গো প্রস্তুত?"—আমি বল্‌লাম, 'হ্যাঁ'—মহারাজা বল্‌লেন—"হ্যাঁ নয়—তা'হ'লে প্রস্তুত হয়ে এখানে ৩টার সময় এসো।"

৩টায় এসে গাড়ী 'রিজার্ভ' করার জন্যই, আই, আর অফিসে আমি, গৌর আর সুরেশ বাবু ছুটলাম, কার্য্য সিদ্ধি হ'ল—হাওড়া এসে পৌঁছান গেল, গাড়ী ছাড়ার প্রায় ১ এক ঘণ্টা আগে। দেখলাম—হেমন্তদা জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকপরে মহারাজা এসে গাড়ীতে উঠলেন—সঙ্গে মহারাজকুমার। যতক্ষণ গাড়ী না ছাড়ল—মহারাজকুমারকে কাছে বসিয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল আমরা তখন

প্লাটফরমে পায়চারী কর্‌ছি। গাড়ী ছাড়ার সময় হ'ল—মহারাজকে প্রণাম করে শ্রীশচন্দ্র নেমে এলেন। দূরপথযাত্রী মহারাজার মুখের উপর সেদিন যে স্নেহশ্যামল মধুর ছায়া এসে পড়েছিল, তা যে না দেখেছে সে বুঝ্‌তে পারবে না। এই তাঁর পুত্র, একমাত্র পুত্র—বিদায় কালীন স্নেহাশীর্ব্বাদ করে কর্ম্মকঠোর পিতার সুদৃঢ় মুখমণ্ডলেও সেদিন স্নেহ-কাতরতার অর্দ্ধস্পষ্ট ছায়া দেখে মুগ্ধ মন কেবলি একটা অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠ্‌ছিল।

ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হওয়ার পরই—মহারাজের সে ভাব কেটে গেল, আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন মথুরা, ইত্যাদির গল্প আরম্ভ কর্‌লেন। রাত্রি ৯টার সময় সঙ্গের খাবারের ঝুড়ি খুলে পরিতোষ সহকারে আহার করা গেল। আর সে আহারের ব্যবস্থা, প্রত্যেক জিনিসটী খুটিনাটি ভাবে বলে দিলেন মহারাজা নিজে। বিছানা করে যে যার মত শুয়ে পড়া গেল।

সকালে চোক খোলার আগেই মহারাজা হাত মুখ ধুয়ে বসে আছেন। আমাকে উঠ্‌তে দেখেই বল্‌লেন—"সকাল বেলাকার সৌন্দর্য্যের একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য্য আছে—যে সকালে কখনও উঠল না, সে জীবনের একটা তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হ'ল।" কোনও উত্তর দিলাম না—বাহিরে চারিদিকের সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে শুধু বসে রইলাম। কতদিনের কথা, বিস্মৃত কত ঘটনার ছবি ক্রমশঃ আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠতে লাগল।—

এই কাশিমবাজারের মহারাজা! প্রথম সাক্ষাৎ তাঁর সঙ্গে আমার, কাশিমবাজার রাজবাটীতে, রেশম কুঠীর বড় সাহেব পি, ই, গুর্ড্ডু আমাকে সুপারিশ-পত্র দিয়ে মহারাজার নিকট পাঠিয়েছিলেন। 'ফ্রি বোর্ডিং' ও 'ফ্রি ষ্টুডেন্টসিপ'এর জন্য। চিঠিখানি পড়ে আমার

মুখের দিকে চেয়ে মহারাজা বল্‌লেন—"তাইত হে, বড় দেরীতে এসেচ, সে সব ব্যাপার যে এক মাস আগে হয়ে গেছে।" কোন কথারই জবাব মুখে এল না। "আচ্ছা তোমার চিঠি থাকল আমার কাছে, সময় হ'লেই খবর দেব।"

সে খবর পেতে আমার দীর্ঘ দিন লেগেছিল, কারণ আমি জানতে পেরেছিলাম স্বর্গীয় অধ্যাপক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে। জনৈক স্বার্থপর রাজকর্ম্মচারী নিজের মনোনীত ছাত্রের জন্য মহারাজকে বলেছিল—"আমার অবস্থা খুব স্বচ্ছল, ছোটখাটো জামিদারীও নাকি আছে" ইত্যাদি।—

কিন্তু কি জানি মহারাজা সে কথা তেমন বিশ্বাস করেন নি, তিনি আমার বিষয় অনুসন্ধান ক'রে যখন জানতে পারলেন বাস্তবিক আমাকে বিদ্যা দান করা—অপাত্রে পড়বে না—তখনই আমার 'ফ্রি বোর্ডিং'এর আদেশ হ'য়ে গেল। আমাকে একখানা দরখাস্ত পর্য্যন্তও করতে হল না। দীর্ঘকাল তাঁরই দানে যা' কিছু শিখেছি, আজ তার সামান্য একটু কাজেও যে লাগাবার সৌভাগ্য হ'ল এজন্য সেদিন একটু তৃপ্তি অনুভবও করেছিলাম।

গাড়ী সমানভাবে চল্‌ছে, আমাদের নানা বিষয়ের কথাও চল্‌ছে। মহারাজা হঠাৎ বলে উঠলেন—"খাসা অম্বুরী তামাকের গন্ধ আস্‌ছে, পাশের কামড়া থেকেই বোধ হয়। বাবুদের 'টেষ্ট' ভাল।" বলা বাহুল্য পাশের কামরাতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা আমাদেরই লোক।

গাড়ীর দুলানিতে হেমন্তদা ঢুলছেন, মৃদুহাস্যে মহারাজা সেইদিকে চাইছেন আর নিঃশব্দে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন—এ যে রেলগাড়ীতে কতবার হয়েছে তার আর ঠিক নেই। ৪৮ ঘণ্টার উপর রেলগাড়ীতে যাত্রা, যে কয়বার আমরা যা কিছু খেলাম—তার খবরদারী

করলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। খাওয়ার সময় দেখা চাইই—এটা দাও ওটা দাও, কার ভাগে কতটা পড়ল—মায় চাকর বাকর পর্য্যন্ত কে কি খেতে পেল না পেল সে খোঁজও তিনি ট্রেণে বসেও করতেন। খাওয়া সম্বন্ধে আমার স্বল্পতা এবং বাছগোছের জন্য তিনি মৃদু হাস্যে কতই না অনুযোগ করতেন। "তোমাদের বয়সে আমরা কি রকম খেতুম জান?—এই বয়সেই বুড়ো হয়ে গেলে—করবে কি হে?" ইত্যাদি।

বৃন্দাবনে এসে গাড়ী থামল—তখন বেলা ৯।১০টা হ'বে। মহারাজার "পুলিন কুঞ্জের" কর্ম্মকর্ত্তাগণ ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। আমরা নামতেই জয়ধ্বনি করে ফুলের মালা গলায় দিয়ে আমাদের মোটরে তুলে দিলেন। প্রথম মোটরে—মাঝে মহারাজা দু'পাশে আমি ও হেমন্তদা। হেমন্তদার সবই দেখলাম পরিচিত, শুনলাম ক'বার তিনি এসেছেন। ষ্টেশন ছাড়িয়েই মহারাজার বৃন্দাবন বর্ণনা আরম্ভ হ'ল। কংসের রাজধানী, কারাগার এমনি কত কি স্থান তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে দেখাতে লাগলেন। দীর্ঘ রেলপথের কষ্ট তাঁকে এতটুকুও কাতর করতে পারেনি। উৎসাহ ও আনন্দের ভাব তাঁর দু'চোখে ভেসে উঠতে লাগ্‌ল।

একটা বিশেষ কথা বলতে ভুলে গেছি। তীর্থ যাত্রা করবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মহারাজার Facial Paralysis এর মত হয়। যে অবস্থায় মানুষ চিকিৎসাধীন থেকে বিশ্রাম করে—কর্ম্মবীর মণীন্দ্র চন্দ্র সে সময় আত্মীয় বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে কুম্ভমেলায় স্নানের জন্য তীর্থ যাত্রী সেজে বসলেন। তাঁর এই অবস্থায় বিদেশ যাত্রা—তাই মহারাজ কুমার ও আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল সঙ্গে একজন ডাক্তার যায়, সেকথা তাঁর কাছে উত্থাপন করতেই তিনি মৃদু হাস্য করেছিলেন মাত্র। তারপর আর কথা কইতে কারো সাহস হয়নি।

আশ্চর্য্য এই যে বৃন্দাবনে দু'চার দিন থাকতেই দেখি মুখের সে বিকৃতি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। মনের জোরে যে মানুষ কঠিন রোগকেও জয় করতে পারে এ মহারাজার জীবনে বহুবার দেখা গেছে।—এই মনের জোর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর কমে এসেছিল—একদিন বললেন— আর সময় আগিয়ে আসছে—দুর্ব্বলতা অনুভব করছি—এ যুদ্ধ আর বোধ হয় বেশীদিন চলবেনা"—শুনে আশঙ্কা হয়েছিল—অত্যুঙ্গ পর্ব্বতের গায়েও কালের ছোঁয়াচ লাগে!

বৃন্দাবনে আমরা প্রায় একমাস ছিলাম। এসময় তাঁকে যেন একেবারে অন্তরের কাছে পেয়েছিলাম। একদিকে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটি নাটি ঘটনার পরিচয়, অন্যদিকে তাঁর অপরাজেয় চারিত্র্য শক্তির বিকাশ—এ যে না দেখেছে, না অনুভব করেছে তাকে বুঝান কঠিন।

মহারাজার সঙ্গে প্রতিদিন সকালে বেড়াতে বের হ'তাম।—গাড়ীর কথা শুন্‌লে ক্ষুন্ন হ'তেন। "বৃন্দাবনে এসেও গাড়ী চড়ব?" যে আপনার সমস্ত মর্য্যাদা - জনারণ্যে বিলিয়ে দিয়েছে তার মর্য্যাদা রাখবার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে শুধু নিজেদেরই অপমান করতাম। "আপনার পাটা একটু ফুলো মনে হচ্ছে হাঁট্‌লে বাড়বে না?"—"তুমি বোঝনা হাঁটলে ওটা সেরে যাবে!"—

বৃন্দাবনে রোজ একবার করে একটা ভাল বাড়ী বাগান সমেত (কুঞ্জ) ভাল যায়গায় খোঁজবার জন্য মহারাজা বের হতেন—আমি ও হেমন্তদা প্রায়ই সঙ্গে থাকৃতাম। পথ চল্‌তে দু'পাঁচ মিনিট অন্তর পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা—প্রত্যেককেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন—"হামারা বহু ভাগ্‌ আপকা দর্শন মিলা"—উত্তরে পথিক বল্‌লেন—"মেরা আজ সুপ্রভাত—রাজদর্শন মিলা"—ইত্যাদি।

একদিন মহারাজা যমুনার ধার দিয়ে চলেছেন-সঙ্গে মাত্র একজন

সেপাহি ও আমি। আমাকে বল্‌লেন—"আবার আস্‌ছে বছর আস্‌ব—তুমি আস্‌বে ত?—না, কষ্ট পেয়ে উৎসাহ ভঙ্গ হয়ে গেছ।"—আমি বল্‌লাম "না, আমার আগে আশঙ্কা ছিল - বিদেশে কখনও বের হইনি—কিন্তু আপনার খবরদারী করতে যারা এসেছে তাদের খবরদারী ত আপনিই করেছেন।—আমি ত নিচিন্ত হয়ে গেছি আপনার সঙ্গে আমি নির্ভাবনায় সব জায়গায় যেতে পারি। তবে ক'দিন বেশ ছিলেন—কালকে আবার জ্বরভাবটা হ'ল কেন? তাই ভাবছি।" "কোনও চিন্তার কারণ নেই—ওটা দাঁতের জন্য হয়েছে। তা ছাড়া গোবিন্দজী আছেন।—মজা কি জান? আমরা দু'নৌকায় পা দিয়ে মরি? ভগবানকে ডাক্‌ব—হরি রক্ষা কর। আবার এক নিশ্বাসেই ডাক্তার ডেকে নিচিন্ত হইতে চাইব। তা আবার কাম্বেল পাশ হলে আজকাল হবে না, এম-বি চাই।"—

কথা কইতে কইতে আমরা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের "প্রেম-মহাবিদ্যালয়ে"র কাছে এসেছি—দেখি অধ্যক্ষ গিদোয়ানী এবং কয়েকজন অধ্যাপক আমাদের দিকেই আস্‌ছেন।—মহারাজকে অভিবাদন করে তাঁরা জানালেন—তাঁরা মহারাজার কাছেই যাচ্ছিলেন তাঁদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করবার জন্য নিমন্ত্রণ করতে।

মহারাজ স্মিত হাস্যে বল্‌লেন—"সে হবে না, রাস্তার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করব না—আপনাদের আমার কুঞ্জে আজ বৈকালে যেতেই হবে।"—বলেই খুব হা হা করে হাস্‌তে লাগলেন। তাঁরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা মহারাজার ক্রীত আর একটি কুঞ্জ দেখতে চলে গেলাম।—

প্রেম-মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন করে—মহারাজা যে appreciationটা লিখে দিয়েছিলেন—সেটা প্রেম মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দশ লক্ষ

ছাপিয়ে বিলি করেছিলেন এবং সেটা ওদিকের প্রত্যেক কাগজে বের হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ মঠ পরিদর্শন করে হাসপাতাল বিভাগে কয়েকটা Bed দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল কিন্তু সেটা আর কাজে ঘটেনি।

বৃন্দাবনের সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের সভাপতিত্বে এক পণ্ডিত সভায় তিনি "ভক্তি রত্নাকর" উপাধি পান। বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রের গবেষণার জন্য তিনি মাসিক সাহায্য এতদিন যে, করে এসেছিলেন তার বিশেষ ফল হয়েছে দেখলাম। কয়েকজন এ বিষয় গবেষণা করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন।

বৃন্দাবনে থাকা কালীন—"পুলিন কুঞ্জে" বহু লোকের সমাগম হ'ত। বাঙলার বাহিরে মহারাজা যে এত পরিচিত তা' পূর্ব্বে জানতাম না—সে কথা আরো জানলাম হরিদ্বার গিয়ে।

বৃন্দাবনে আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে খেতাম—মহারাজার বৈবাহিক স্বর্গীয় হেমেন্দ্র বাবু ও বিষ্ণু বাবুও প্রত্যহ ওখানে আমাদের সঙ্গে খেতেন। সবাই না বসলে মহারাজা খেতে বস্‌তেন না। একদিন বিষ্ণু বাবু তাঁর কুঞ্জ থেকে আস্‌তে প্রায় এক ঘণ্টা দেরী করলেন, মহারাজ সমান বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি আর হেমন্তদা বিরক্তিতে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি—মনের ভাব বুঝতে পেরে মহারাজ বল্‌লেন—"জীবনে অনেক কিছুর জন্য সহিষ্ণুতা শিক্ষা করতে হয় - কোনও একটা ঘটনা উপলক্ষ্য মাত্র।" আমি লক্ষ্য করেছি—মাঝে মাঝে তাঁর মুখ দিয়ে এমনিই একটা গুঢ় কথা বের হ'ত।

আমার মনের এই বিরক্তি একদিন গভীর লজ্জায় আমাকে চিরদিনের জন্য শিক্ষা দিয়ে গেল। সেদিন স্নান করতে নেমে দেরী হয়ে গেল। এসে দেখি সেই খাবার সাম্‌নে করে কাশিমবাজারের মহারাজা বসে

আছেন। বিষ্ণু বাবু হেমেন্দ্র বাবুরও ক্ষমতা নাই—আগে খেতে বসেন। আমি গিয়ে আসনে বস্‌তেই একটু মৃদু হেসে মহারাজ বললেন—"আচ্ছা, এবার বসা যাক"—আমার দিকে চেয়ে বললেন—"সাবিত্রী বুঝি খুব শীত-কাতুরে ?"—আমি রাম গঙ্গা কিছু না বলে—ভাবতে লাগলাম—এমনি করে চিরদিন এই মানুষের কাছে থেকেও যাদের মনুষ্যত্ব অর্জ্জন হয় না—তারা সত্যই দুর্ভাগা।

মহারাজ কুমারের চিঠি প্রায় রোজই আসত—দু' এক দিন দেরী হলে মহারাজা ব্যস্ত হ'য়ে উঠতেন। বৃন্দাবনে পৌঁছে অবধি মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী হিসাবে আমি কাজ করতাম এবং সেই ভাবেই আমাকে পরিচিত করা হ'ত। কোনও চিঠিতে সেক্রেটারী বলে নাম সই করতে ইতস্তত: করে যদি জিজ্ঞাসা করতাম—"কি নামে চিঠিখানা যাবে ?—" মহারাজ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিতেন "Paivate Sercet&ry to the Maharaja, Kasimbazar"—

আমার ফাউনটেন পেনটিতে তিনি প্রত্যহ নাম সই করতেন—আর বল্‌তেন—"তোমার কলমটি বেশ কিন্তু—কত দাম ?—আমার এ জীবনে আর ওসব হ'ল না।"—লজ্জিত হয়েছি বুঝতে পেরে বল্‌তেম—"তবে যে কাল পড়েছে তাতে দোয়াতে কলম ডোবাবার সময় কৈ ?—ওতে কাজের সুবিধে অনেক।"

মহারাজকুমারের চিঠি এলে সেখানি আগে খুলে মহারাজাকে দিতে হ'ত—একদিন সে চিঠি পেতে দেরী হলে—বল্‌তেন—"ব্যাপার কি বল দেখি, কুমারের চিঠি কৈ ?" আর একদিন এমনি দেরী হওয়াতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার কাছে কোনও চিঠি এসেছে ?"—আমার কাছে সত্যই সেদিন কুমারের চিঠি এসেছিল। (মহারাজার চিঠিখানি ডেলিভারীর গোলমালে বৈকালে আমরা পেয়েছিলাম) আমি মহা কুণ্ঠায়

পড়লাম। আমার কথা কইবার আগেই বল্‌লেন—"সব ভাল আছে তো" আমি বল্‌লাম "হাঁ"—কুমারের প্রতি সেদিন তাঁর যে বিরক্তির ভাব এসেছিল তার মধ্যে পিতৃস্নেহের মধুর Jealousy আছে, আমার লজ্জিত হ'বার কিছু তাতে ছিল না।

বৃন্দাবন থেকে বর্ষাণ প্রভৃতি স্থান ঘুরে এলাম। সেখানে ব্রাহ্মণদের লাড্ডু খাওয়ান হ'ল। এ নাকি মহারাজা গেলেই তাদের বরাদ্দ ছিল। তাদের খাওয়া দেখে মহারাজার কি আনন্দ! বর্ষাণ পাহাড়ে মহারাজা বিকানীরের একটা প্রাসাদ আছে সেখানে উঠ্‌বার সময়—মহারাজার কষ্ট হচ্ছে বেশ বুঝতে পারলাম—এমন কি আমার যেন মনে হ'ল তাঁর Heart Palpitation হচ্ছে—কিন্তু নিজের রোগের কথা তিনি কখনও প্রকাশ করতেন না—যত কষ্ট হচ্ছে ততই তিনি এক একবার দাঁড়িয়ে এটা ওই, ওটা সেই ইত্যাদি বলে দিবার ফাঁকে নিজেকে সাম্‌লে নিতে লাগ্‌লেন। Palpitation যে সেদিন হয়েছিল তা স্বীকার করেছিলেন—আমার কাছে দশ বার দিন পরে কি একটা কথার প্রসঙ্গে।

মোটরে চড়ে বস্‌লে—মোটর দ্রুত না চল্‌লে মহারাজা বিরক্ত হতেন। বর্ষাণ থেকে ফেরবার পথে দ্রুতগামী মোটর বাসের সার্শী ভেঙ্গে মহারাজার মাথার ঠিক কাছ দিয়ে আমার পায়ের উপর পড়ে ভেঙ্গে গেল—আমি বল্‌লাম—"ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন" মহারাজা বল্‌লেন—"ভগবানই ত রক্ষা করেন"—তার পর সারা পথ তিনি একটা কি যেন বিশেষ চিন্তা করতে করতে পুলিনকুঞ্জে ফিরে এলেন। এই দুর্ঘটনার জন্য আমার মনটা যেন কেমন ক্ষুণ্ণ হয়ে রইল।

তার পরের দিনই গিরিগোবর্দ্ধন যাওয়ার আয়োজন। ভোরে উঠেই দেখি যে, যে পাণ্ডাঠাকুরের উপর মোটর ঠিক করার ভার ছিল—মাত্র চারি টাকার কৈফিয়ৎ দেখিয়ে মহারাজার নিকট বাহাদুরী নেবার লোভে

যে বৃহৎ বাসখানি তিনি এনেছেন - তাতে আমার মত দরিদ্রেরও চড়তে আশঙ্কা ও দ্বিধা হতে লাগল।

মহারাজা পাণ্ডাজীর কার্য্যতৎপরতার বহু তারিফ করে আগেই গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেন। আমি পাশেই বস্‌লাম। মহারাজা আদেশ দিলেন— "খুব জোরসে চালাও—দশ বাজে হাম হুঁয়া পৌঁছানে মাঙ্গতা" শুনে ত আমার চক্ষুস্থির! মহারাজা বলেন কি? এই ত বাস্‌খানার অবস্থা— তাতে যদি জোরসে চলে তা হলে ত আর হাড় ক'খানা আস্ত থাক্‌বে না। আমি মহারাজাকে উদ্দেশ করে বল্‌লাম—"শুনেছি এদিকের রাস্তা আগের চাইতে ঢের খারাপ হয়েছে— তার উপর বাসখানাও তেমন ভাল নয়— আস্তে আস্তে গেলেই ভাল হয় না কি?"

মহারাজা বিরক্তই হলেন— বল্‌লেন—"তুমি বড় Nervous! তাহলে মোটর না চড়ে গরুর গাড়ী চড়লেই হয়।" আর কোনও কথা হ'ল না— চারিদিকের অসংখ্য রমণীয় দৃশ্য, ময়ূর আর হরিণের দল দেখে সব ভুলে গেলাম। কিন্তু পথের কষ্টে এমনই শরীর খারাপ হয়েছিল যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে আর আমাকে উঠ্‌তে হল না। শয্যা নিলাম। বিদেশ— ভয়ও করতে লাগল। মহারাজা সাতপুকুরে স্নান করে পুণ্য অর্জ্জন করবেন বলে প্রস্তুত—আমাকে খোঁজ করতেই হেমন্ত দা বল্‌লেন "সাবিত্রী নাইবে না—শরীরটা তার ভাল নয়।"

এখানে আমরা মহারাজার কুঞ্জেই এক বেলার জন্য ছিলাম। আহারান্তে আবার মোটরে ওঠা গেল। ফিরবার পথে—মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের সমাধি দেখ্‌বার ইচ্ছা আমার বহু পূর্ব্বেই ছিল। রাস্তায় এসে মোটর দাঁড়ালে মহারাজা বল্‌লেন—"তুমি বড় কুমারের সমাধি দেখতে যেতে পারবে?—অনেকখানি হাঁটতে হ'বে কিন্তু।" "পারব" বলেই উঠে দাঁড়ালাম।

দীর্ঘ বনপথ, পাথর আর কাঁকরে ভরা—বাস থেকে পথে নেমে অবধি মহারাজার মুখমণ্ডলের উপর যেন শোকের গভীর ছায়া ঘনিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। মুখে বার বার হরিধ্বনি করতে লাগলেন। পথিমধ্যে লালাবাবুর সমাধির অবস্থা দেখ্‌লাম অতি শোচনীয়। একদিন অজস্র সম্পদ ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করে, যে মহাপুরুষ সন্ন্যাস নিয়ে বিলাস আগার ছেড়ে, ভগবানকেই আশ্রয় করে সাধনার দুর্গম পথের চিরপথিক সেজে বেরিয়ে পড়েছিলেন—তাঁর শেষ সমাধির দুর্গতি দেখে মনে বাস্তবিকই দুঃখ হ'ল।—

যদুপতে কঃ গতাঃ
কঃ গতা মথুরাপুরী ?

মহিমচন্দ্রের সমাধির কাছে এসে মহারাজা যে ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাতে মনে হল বৃদ্ধ পিতার বুকে এতদিনকার জমা করা শোকের তুহীন রাশি বুঝিবা আজ সহস্র ধারায় ফেটে গলে পড়ে। অদম্য হৃদয়ের বল—মহারাজা বার কতক সমাধির দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে বল্‌লেন "চল যাওয়া যাক্।" অলক্ষ্যে কখন যে আবার দু'চোখ বেয়ে দু'ফোটা জল পড়েছে টেরও পায়নি। বড় কুমারকে দেখিনি—তাঁর সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিও না। যা' কিছু শুনেছি শ্রীশচন্দ্রের কাছে। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম এ সমবেদনার উৎস কোথায় ? কৈশর কাল থেকে কাশিমবাজার রাজপরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—শ্রীশচন্দ্রের সাহচর্য্যে সখ্যতায় নিজের মধ্যে এই লোকবিশ্রুত রাজ-পরিবারের প্রতি এমনি একধা আত্মীয়ের ভাব আমার মধ্যে পুষ্ট হয়ে এসেছে, যার জন্য মহিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্রেরই দাদা বলে আজ তাঁর সমাধি দেখে সমবেদনায় আমার চোখেও আজ জল !—হায়রে মানুষের মন !—

এমনি করেই ত মানুষের সঙ্গে অতি অপরিচয়ের পথে প্রাণের সম্বন্ধ মধুর ও নিবিড় হয়ে ওঠে। চল্‌বার পথে এইটুকুই ত লাভ!

দু'চার দিন পরেই হরিদ্বার রওনা হওয়া গেল।—চারিদিকের যে প্রাকৃতিক শোভা তা' বর্ণনা করবার এখানে অবকাশ নাই—তবে মহারাজার মধ্যে এই নৈসর্গিক দৃশ্যের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল—প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে তৃপ্তিলাভ করবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল এ কথা যখনই তাঁকে গাড়ীর জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে বিস্ময়াপন্ন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকৃতে দেখেছি তখনই মনে হয়েছে। চোখের সে অনন্ত অন্বেষণের চাহনী, মুখের সে আনন্দ-উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখে আমারও চোখে পলক পড়ত না। মহারাজা গায়ক ছিলেন একথা কোথাও শুনিনি—কিন্তু তাঁর মৃদু মধুর গুঞ্জন শব্দে গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এই হরিদ্বারের পথে। এই আত্মভোলা মানুষটিকে দেখবার ও বুঝবার যে কত দিক আছে তাই ভেবে আমার শঙ্কা হয় যে—তাঁর জীবনী লেখবার গুরু দায়ীত্ব তিনি নিজ হাতে আমার উপর দিয়ে গেছেন—তার মর্য্যাদা বুঝি আমি রাখতে পারব না।

হরিদ্বারে নেমে দেখি—ষ্টেশনে সন্ন্যাসীর মেলা—মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্রকে সসম্মানে তাদের মঠে আগিয়ে নিতে এসেছে। ওখানকার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সব চাইতে যাঁদের স্থান উঁচুতে তাঁদেরই দলের বাঙালী সন্ন্যাসী স্বামী ভৈরবানন্দ, পুরোভাগে বহু হস্তী, অশ্ব, আশা সোটা, সজ্জিত যান, বহুমূল্য রাজছত্র স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ড ইত্যাদি নিয়ে। যে হাতিটা মহারাজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল, তার গায়ে অলঙ্কারের মূল্য ন্যূনকল্পে এক লক্ষ মুদ্রা! এইভাবে ত মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করে সন্ন্যাসীরা নিয়ে গেলেন! দুই পাশে ফেনায়িত জন-সমুদ্র

—সে কি জনতা, আমি জীবনে এমন দেখিনি—আর দেখবও না। সবাই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখছে কে এই সামান্য পরিচ্ছদধারী বাঙালী, যাকে সসম্মানে শোভাযাত্রা করে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে নিয়ে চলেছে কৌপীনবস্ত্র সন্ন্যাসীর দল? মনে হল—এদের সঙ্গে এই রাজা-সন্ন্যাসীটির যে নাড়ীর যোগ আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরিত্র ওজনের নিক্তিতে মহারাজার ওজনও বেশ চল্‌তে পারে। চারিদিকে মহারাজের বিপুল জয়ধ্বনি—মাঝে মাঝে মহারাজের দিকে চেয়ে দেখছিলাম আর আনন্দে, সারা বুকটা ভরে উঠছিল—এই ভেবে যে ইনি আমাদেরই মহারাজা, আমাদেরি একান্ত আপনার জন পরমাত্মীয় বাঙালী।

মহারাজার বন্ধু, ষ্টেট কাউন্সিলের একজন হিন্দুস্থানী ধনকুবেরের বাঙলো খানি ভীমগোদায়, ঠিক গঙ্গার উপরই অবস্থিত। সেইখানেই আমাদের থাকার জায়গা হয়েছিল। অতি মনোরম স্থান। একটি কামিনী গাছ তলার বেদীর উপর বসেই মহা আরামে মহারাজা বল্‌লেন—"আঃ বাঁচা গেল। হরিদ্বারে একখানা ছোট বাড়ী কিন্‌তে হবে।" সে আশা তাঁর আর পূর্ণ হ'ল না। দেখিছি বৃন্দাবনের চাইতেও তিনি হরিদ্বার বেশী পছন্দ করতেন।

আমরা হরিদ্বারে কয়েক ঘণ্টা থাকার পরই যেভাবে দর্শকের সংখ্যা বাড়তে লাগল, তাতে মনে হ'ল মহারাজার আগমন বার্ত্তা ইতি মধ্যেই চারিদিকে রটে গেছে। সেই বিপুল জন সমাগম—কে কাকে চেনে কিন্তু কাশিমবাজারের দানবীরকে দেখবার জন্য প্রত্যহ বিভিন্ন দেশবাসী নরনারীর যে প্রকার সমাগম হ'ত তাতে মনে হয়েছে যে- তাঁর সৎকার্য্যে দান দেশ বিদেশে শ্রুতকীর্ত্তির মত অমর হয়েই থাকবে।

পাঞ্জাবীদের দেখতাম সব চেয়ে ভক্তি বেশী মহারাজার উপর। তাঁকে তারা বলত 'দেবতা' মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তারা

দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে থাকত—মহারাজা কেবলি বলতেন—"আপনারা উপরে উঠে আসুন।" তারা বিনয়ের সঙ্গে প্রতিবাদ করে রাজ দর্শন করে চলে যেত।

কুম্ভ মেলার ঠিক আগের দিন মহারাজা বললেন—"চল সাবিত্রী, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে, কাল মিছিল দেখতে হবে। একটা বাড়ীর ছাদ ভাড়া করে আসি।" সঙ্গে চললাম। ব্রহ্মকুণ্ডের চৌমাথা রাস্তার উপর একখানা বাড়ীর ছাদ ভাড়া করার জন্য উঠা গেল। উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে আছি—হঠাৎ দেখলাম একজন শিখ যুবক যাকে বলে শাল প্রাংশু মহাভুজ, হঠাৎ জনসমুদ্রের আবর্ত্তে পড়ে গেল। তখন চারিদিক থেকে যাত্রীর দল ব্রহ্মকুণ্ডের পথে আসছে, তাদের পায়ের তলায় শিখযুবক ভবলীলা সাঙ্গ করে হয়ত বা কুম্ভমেলার অক্ষয় পুণ্য বিনা স্নানেই অর্জ্জন করে স্বর্গস্থ হ'ল—কিন্তু এ দৃশ্য দেখে কাল কুম্ভমেলা দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ত আমার অন্ততঃ রইল না; শরীর মন যেন অবসাদ ও উদ্বেগে ভরে উঠ্‌ল। মহারাজকে সম্বোধন করে বল্‌লাম "মহারাজ, এর পরেও কি আপনি কাল মিছিল দেখতে আসবেন মনে কর্‌ছেন?" বিষণ্ন ভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মহারাজ উত্তর দিলেন—"দেখা যাক, কি হয়।"—ছাদ ভাড়া হ'য়ে গেল। সামনের একটী ছাদে দেখ্‌লাম উমাপ্রসাদ (স্যর আশুতোষের পুত্র) তাঁর বাড়ীর সকলকে নিয়ে ছাদ ঠিক করতে ব্যস্ত—অল্প কথাবার্ত্তা হ'ল—উমাপ্রসাদ মহারাজকে অভিবাদন করলে—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"স্যর আশুতোষের ছেলে নয়?" আমি বল্‌লাম—'আপনি চেনেন?' "হাঁ আমি ওঁদের সকলকেই চিনি। বলেই স্যর আশুতোষের বহু গুণের কথা বলে যেতে লাগলেন। আমি কখনও কোনও লোকের নিন্দাবাদ তাঁর মুখে শুনিনি; যার গুণ ব্যাখ্যান করার আছে তাঁর গুণ তিনি

পঞ্চমুখে গাইতেন কিন্তু যেখানে সে অবকাশ নেই সেখানে নিন্দা করার দুর্ব্বলতাকেও তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি।

বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে বাসায় ফিরতে আমাদের বেলা ১টা বাজল। ঐদিন সমস্ত ক্ষণ মহারাজকে বিষন্ন দেখলাম, কে জানে তীর্থযাত্রী শিখযুবকের আকস্মিক মৃত্যু তাঁর প্রাণে ব্যথার সঞ্চার করেছিল কি না।

কুম্ভমেলার দিন। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে চোখ মেলে দেখি কোমরে গামছা বাঁধা সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র। "কিহে তুমি যাবে না"—আমি বল্‌লাম্—"কালকের দুর্ঘটনা দেখে আমার মনটা ভাল নেই—আমি আর ভীড়ে যাব না"—মহারাজা একটু হাস্‌লেন মাত্র—কোনও উত্তর দিলেন না—মনে মনে একটু লজ্জাও পেলাম—এই ৬৮ বৎসরের বৃদ্ধ যেখানে হাসিমুখে প্রস্তুত, সেখানে আমি যুবক হ'য়ে উৎসাহহীন কেন? কিন্তু ভীড় আমার বরদাস্ত হয় না। বাহিরে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াই আর শুনি—অমুক জায়গায় একজন পড়ে মারা গেছে—অমুকের মায়ের দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে—একজন যুবকের Heart fail করেছে—শুন্‌ছিলাম আর মহারাজা সম্বন্ধে একটা অজানিত আশঙ্কায় হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠছিল। মাঝখানে একবার হেমন্ত দা এসে খবর দিলেন—মহারাজা মেয়েদের নিয়ে (মহিমচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, জামাতা অমর বাবু ও পরিবারস্থ দু'এক জন হরিদ্বারে মহারাজার অতিথি হ'য়েছিলেন।) কিছুক্ষণ পরে একটা বিপুল জনস্রোতে কোথায় বা চোপদার আর কোথায় বা সিপাহী—লক্ষ লক্ষ নর নারীর মধ্যে কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তখন বেলা ৪টা—আমাদের তখন কি যে মনের অবস্থা তা প্রকাশ করবার নয়। পল গুণতে লাগ্‌লাম। প্রায় দু' ঘণ্টা পরে খবর আস্‌ল—মহারাজা গঙ্গার পরপার দিয়ে আস্‌ছেন। আমি জটিলা ও বেণী

গঙ্গাগর্ভে নেমে গেলাম—ওখানকার গঙ্গার জল আড়াই কি তিন হাত মাত্র গভীর। বেণী ও জটিলা পার হয়ে মহারাজার নিকট গেল। মহারাজার হাতে ছিল একটা ছাতি—সেইটা নিয়েই তিনি ঘণ্টায় ২৫।৩০ মাইল বেগ স্রোতের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছিলেন—পাশে বেণী ও জটিলা, আমি এপারে জলে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মহারাজার পা হড়কে গলা পর্য্যন্ত জল, ছাতার মধ্যে জল ঢুকে মহারাজার দেহকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আর কি!—খুব ক্ষিপ্রহস্তে বেণী মহারাজাকে ধরে ফেল্‌লে।—সে সময় কি যে মনের Tension তা বর্ণনা করা যায় না। মহারাজাকে ধরাধরি ক'রে বাসায় আনা হল—গরম জলে পা ধুইয়ে তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌ল। সুস্থ হলেন আর বার বার ভগবানের নাম করতে লাগলেন, আমরা চারিপাশে দাঁড়িয়ে। রাত্রে তাঁর সামান্য জ্বর হ'ল কিন্তু সেকথা জান্‌তে দিলেন না—পরদিন গভীর রাত্রে হৃষিকেশ ও লছমনঝোলা যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। হৃষিকেশ থেকে গঙ্গা পার হ'য়ে হাঁটতে হ'ল প্রায় দেড় মাইল, মহারাজ সেই শরীর নিয়ে সমানে হেঁটে চল্‌লেন। লছমন ঝোলা দেখা ও সেখানে স্নান করার পর হরিদ্বারের উপকণ্ঠে এসে যখন পৌঁছান গেল তখন বেলা ২টা। একজন এসে খবর দিল শিখ মটর ড্রাইভারদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের দাঙ্গা হয়ে গেছে, খুনও নাকি হয়েছে; সেই জন্য মটর আর এগুতে দিচ্ছে না—এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে। আবার হাঁটা সুরু হ'ল—সেও প্রায় দু' মাইল রাস্তা। নিজের পা আর যেন চল্‌ছিল না—মনে মনে ভাবছিলাম—মহারাজার কি কষ্ট হয় না?

—সেইদিন রাত্রি থেকে মহারাজার খুব জ্বর হল।—পরদিন কুমারকে টেলিগ্রাম করতে চাইলাম—কিছুতেই তা' মহারাজা করতে দিলেন না; বললেন "শুধু তাদের ব্যস্ত করা হ'বে—ক্লান্তিতে জ্বর হয়েছে সেরে যাবে।"

কিন্তু সারল না ক্রমশঃ বাড়তে লাগল।— দেরাদুন, মশুরি যাওয়ার কথা ছিল তা আর হ'ল না।—এই বিপদের মধ্যে প্রহ্লাদ চাকরের হল কলেরা। গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যপরিদর্শক মহারাজকে দেখেছিলেন। তিনি প্রহ্লাদকে হাসপাতালে পাঠাতে চাইলেন— মহারাজা কিছুতেই তাতে মত দিলেন না। অবশেষে মহারাজা যখন জ্বরে প্রায় অচৈতন্য—সেই সুযোগ নিয়ে প্রহ্লাদকে হাসপাতালে পাঠান হল;— জ্ঞান হতেই তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন—ধীরে ধীরে সব কথা বুঝিয়ে বলে - ডাক্তার বাবুর উপরই বেশীর ভাগ দোষ চাপিয়ে দিয়ে সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

প্রায় তিন দিন এইভাবে কাটল—। কি যে উদ্বেগ, কি যে আশঙ্কা কি যে মনের উৎকণ্ঠার মধ্যে ক'টা দিন কাটাতে হয়েছিল সে কথা আজ ভাবলেও বুক কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে বহুক্ষণ ধরে মহারাজার কাছে বসে থাকতাম—ঘুমুচ্ছেন দেখলে—পাশের ঘরে এসে আমি আর হেমন্তদা মুখোমুখী হয়ে চুপটিকরে বসে থাকতাম। কারো মুখে কথা নাই—বেণী সব সময়েই প্রায় আমোদে কাটাত, জটিলার সঙ্গে খুনসুড়ি করত—তারাও বিমর্ষভাবে আছে—চাকর বাকর সবাই যেন কেমন একটা অভিভূত অবস্থায় চলাফেরা করছে। তখনও হরিদ্বারে ভীড় যথেষ্ট—পুণ্য সঞ্চয় করে অগণিত পথযাত্রী কেবল সংসার-গৃহে ফিরতে আরম্ভ করেছে মাত্র—পথে কোলাহলের অন্ত নেই—কিন্তু তারই মধ্যে অবস্থিত আমাদের বাঙ্গলো খানার উপর কে যেন নিস্তব্ধতার যবনিকা টেনে দিয়েছে। তেমনি সেদিন অনুভব করেছিলাম—মহারাজার মহাপ্রস্থানের রাত্রিতে। সারকুলার রোডের সমস্ত বাড়ী খানা যেন কোন মায়াবিনী নিষ্ঠুরা রাক্ষসী তার বিস্তৃত ডানা দিয়ে অন্ধকার করে রেখেছিল—কথা কইবার প্রবৃত্তি নাই—সে শক্তিও যেন সেদিন

ছিল না—ধীরে অতি ধীরে তার যবনিকা জাল গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হতে লাগল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের শঙ্কাকুল মনগুলি যেন আসন্ন বিপদের নিশ্চয়তা জেনে ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে আসছিল—সে যে কি প্রচণ্ড মানসিক যুদ্ধ তা বলে বুঝান যায় না।—সেদিন মহারাজের আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করতে করতে কেবল এই কথাই মনে হচ্ছিল—অন্যের মৃত্যু প্রতীক্ষা করে' যারা জীবন থাকতেও মৃতপ্রায় হয়ে আসে তাদের যন্ত্রণাও বুঝি মৃত্যুযন্ত্রণার চাইতে কম নয়। সেদিন হরিদ্বারের রোগ শয্যায় শায়িত মহারাজার কথা বার বার মনে হচ্ছিল—কিন্তু সে দুর্দ্দিনও ত কেটে গিয়েছিল—।

তিন দিন পর একটু সুস্থ হয়েই আমাকে বললেন "শ্রীশচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করে দাও বাড়ী যাচ্ছি।" বলা বাহুল্য তাঁকে লুকিয়েই তাঁর অসুস্থ সংবাদ আমরা কুমারকে আগেই দিয়েছিলাম।

গাড়ী রিসার্ভ করতে গিয়ে দেখি মহাবিভ্রাট In order of application—Reserved গাড়ীর তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুসারে গাড়ী পেতে হ'লে এখনও সাতদিন এখানে পড়ে থাকতে হবে। আর অসুস্থ মহারাজকেই বা বলব কি ফিরে গিয়ে। আমি আর হেমন্তদা ছুটাছুটি করতে লাগলাম। প্রত্যেক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর কাছে সেদিন যতগুলি বিভিন্ন বক্তৃতা আমায় দিতে হয়েছিল—তা'তে বক্তা হবার পক্ষে আমি বেশ আশান্বিত হয়ে পড়েছিলাম।—যাক Spacial officer এর কাছে গিয়ে শেষ বক্তৃতার কাজ হ'ল। আমি দৃঢ়ভাবে তাকে বললাম—"Then you run the risk of Maharaja's life. You speak so much of him but you cannot utilise your privileged station to help the sick Maharaja in this critical time"—"Run the risk of Maharaja's life? What

do you mean?" 'I have said what I have meant"—হেমন্তদা আমার গা টিপছেন। আমি সত্যই তখন রাগে দুঃখে প্রায় কাঁপছি। যাক রাগে ও রূঢ় কথায় কাজ হ'ল—গাড়ী সেইদিনই বৈকালের দেরাদুন এক্সপ্রেসে 'রিজার্ভ' হয়ে গেল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

মহারাজকে দুধ সাগু খাইয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে মন যেমন আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল শরীরটা তেমনি যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগ্‌ল।

প্রত্যাবর্ত্তনের দীর্ঘ ট্রেণযাত্রার মধ্যে একটা ঘটনা যা ঘটেছিল—তার কথা আমি কখনও ভুলব না।—কিন্তু সে কথার উল্লেখ করে আজকে আমি কারো প্রাণে ব্যথা দিতে চাই না। বহু অকৃতজ্ঞ জনের অপরাধ, বহু অকৃতজ্ঞের অপকর্ম্মকে তিনি সর্ব্বদা ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখে গেছেন। তাই ভাবছি—আজ ত আর সে মনুষ্যত্বের মহাতাপস মণীন্দ্র চন্দ্র ইহজগতে নাই—কে আর আমাদের অপরাধ আমাদের অকৃতজ্ঞতা ক্ষমা করবে—? তাঁর গত জীবনের সকল পুণ্য কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে আজও কি আমরা আমাদের সৎকর্ম্মের দ্বারা তার ঋণ কিছু পরিমাণে পরিশোধ করবার চেষ্টা করব না?

"Surely the public, for whom "he has done so much, will repay in part the great debt of obligation which they owe the champion of their liberties and virtues; or are they dead, cold, stone-hearted and insensible—brutalised by centuries of unremitting bondage?„

(উপাসনা হইতে উদ্ধৃত)

সর্ব্বত্যাগী মণীন্দ্রচন্দ্র

[শ্রীনৃত্যগোপাল সরকার]

প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে, তখন বহরমপুর কলেজে বি, এ, ক্লাসে পড়ি। একদিন অপরাহ্নে কলেজ হইতে বাটী প্রত্যাগমন কালে, এখন ষ্ট্যাণ্ড রোডের যে স্থানে বহরমপুর মধ্যবঙ্গবিদ্যালয় অবস্থিত, তাহার নিকটে আমার সমবয়স্ক এক যুবক, পরে জানিলাম রাজেন—আমাকে আসিয়া জানালেন যে, তাঁহার মাতুল মহাশয় আমাকে ডাকিতেছেন। যুবককে অনুসরণ করিয়া পরলোকগত ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়েরর বাটীর নিকটস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে গেলে, এক সুশ্রী সৌম্য মূর্ত্তি আসিয়া স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল মুখে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার পরিবারস্থ কয়েকটি বালককে পরদিন কলেজ যাইবার পথে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ যৎসামান্য, কিন্তু যে ভাবে, যে মধুর সলজ্জ বিনয়ের সহিত অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, বোধ করি অনুরোধ কঠিন হইলেও তাহা প্রত্যাখানের উপায় থাকিত না। কাশীমবাজারের ভাবী অধীশ্বর, বাঙ্গালার গৌরব-রবি, মণীন্দ্রচন্দ্রের সহিত ঐ ভারাটীয়া বাটীতে এইরূপে আমার প্রথম পরিচয় স্থাপিত হইল।

তাহার পর, তাঁহার রাজ্যলাভের পূর্ব্বে কয়েকবৎসর ধরিয়া নানা কার্য্যে ও নানা উপলক্ষে সেই পরিচয় উত্তরোত্তর গাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। বহরমপুরের সেনবংশীয় জমিদার বাবুগণের সহিত তাঁহার অতিশয় হৃদ্যতা ছিল, তিনি যখন জানিলেন যে আমি তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ তখন তিনি অধিকতর স্নেহে আমাকে টানিয়া লইলেন।

ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার যে সকল সদ্‌গুণের চরমস্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, ঐ সময়েও কিন্তু তাহার কোনটীরই একান্ত অভাব দেখিতে পাই নাই। অসীম সহিষ্ণুতা, অসাধারণ চিত্তসংযম, মনের গভীর ঔদার্য্য, মধুর আলাপন, দুঃস্থের সাহায্য, ধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি প্রভৃতি সকল গুণেরই তিনি তখনও অধিকারী ছিলেন, রাজ্যপ্রাপ্তির সহিত এগুলি লাভ করেন নাই। পরিবারের মধ্যে তিনি তাঁহাকে দিয়াই যে মহান্ আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, সে আদর্শ পরিবারের অন্যান্য সকলেই অনুসরণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, ফলে নন্দী পরিবারের ভিতরে সর্ব্বদাই একটা সুন্দর প্রীতিভাব বিরাজ করিত। ঐ সময়েও বহরমপুর ওয়ার্ড হইতে মিউনিসিপালিটীর কমিশনার হইবার প্রার্থী হওয়ায় তাঁহার জনসেবার্থে আত্মনিয়োগের স্পৃহার পরিচয়ও সকলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য প্রার্থী হইয়া তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন এবং সফলকাম হইয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের অবসান মনে করেন নাই, বহরমপুর ওয়ার্ডের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন।

তাঁহার স্বভাবের মাধুর্য্যগুণে রাজা হইবার পূর্ব্বে জনসাধারণের অন্তরে তিনি কতখানি স্থান অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, ১৩০৪ সালে তাঁহার রাজ্যলাভ করিয়া কলিকাতা হইতে আজিমগঞ্জের পথে ষ্টীমারে আসিয়া ৺হরিবাবুর বাঁধা ঘাটে অবতরণের সময় সেই বিরাট জনতার বিপুল আনন্দোল্লাস। অগণিত লোক-সমুদ্রের মধ্যে উত্থিত সঘন জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল, সহস্র সহস্র শুভাকাঙ্ক্ষী প্রবীণের আশীর্ব্বাদ, সহস্র সহস্র অকপট বন্ধুর স্নেহালিঙ্গন, সহস্র সহস্র বয়োকনিষ্ঠের নমস্কার লাভ করিয়া মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র ঘাটে উঠিলেন এবং সেই বিরাট জনতা সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ বন্ধুবর বিষ্ণুচরণ সেন জমিদার মহাশয়ের

সুপরিচিত বাগান বাটীতে উঠিয়া অসামান্য বন্ধু প্রীতির পরিচয় দিয়া, তথা নিজেকে সাধারণের নিকট প্রিয় হইতে প্রিয়তর করিয়া, তবে মহাসমারোহে মিছিলি যোগে কাশীমবাজার রাজবাটীতে গিয়া রাজতক্তে উপবেশন করিলেন।

সেই বৎসরই বড়দিনের ছুটির সময় কাশীমবাজারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে নানাকথার সহিত ইহা'ও বলিয়াছিলাম যে, বিদেশে চাকৃরী মনঃপুত হইতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "ও চাকৃরী আর করিতে হইবে না—আপনি এখানে আসিয়া আমাকে সাহায্য করুন।" গভর্ণমেণ্টের চাকৃরী ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

তাহার পর হইতে এযাবৎ, এই সুদীর্ঘ ৩২।৩৩ বৎসর কাল প্রতিদিন যে দেশবরেণ্য মহাপুরুষের, যে দানবীর ও কর্ম্মবীরের অতি সান্নিধ্যে তাঁহার সহচর, অনুচর ও পার্শ্বচররূপে—জীবন যাপন করিয়া গৌরব অনুভব করিয়াছি, যে স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিয়া সতত নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি—আজ তিনি নাই! হায়রে! কাশীমবাজারে নাই, সৈদাবাদে নাই, কলিকাতার হর্ম্ম্যে নাই, স্বর্গাদপি গরীয়সী বঙ্গভূমে, অথবা এই বিস্তীর্ণ ধরাধামের কোথাও নাই, খুঁজিয়া পাই না। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন, পশ্চাতে শত-সহস্র-লক্ষাধিক কীর্ত্তিস্তম্ভ শাশ্বতকালের নিমিত্ত প্রোথিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার হতভাগ্য দেশ যখন তাঁহাকে আরও—আরও—বেশী করিয়া পাইবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কত কথাই না আজ মনে পড়িতেছে, এক এক করিয়া প্রতিদিনের কত ঘটনা—কত সুখ দুঃখ বিজড়িত স্মৃতি মনের প্রতি কোণে কোণে ভাসিয়া উঠিতেছে—লিখিয়া কত জানাইব? প্রতিদিনই ত তাঁহার অমিয়মাখা

চরিত্রের নব নব বিকাশ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছি—লিখিয়া কি তাহা জানান যায় ?

রাজ্যলাভের কিছুকাল পরেই মহারাজা যখন প্রথম মফঃস্বল পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বনগাঁওয়ে তাঁবু করিলেন, তখন সেই রাত্রিতে তাঁহারই তাঁবুর ভিতর বহরমপুরের স্বনামধন্য ডাক্তার ৺ব্রজেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় ও আমি শয়ন করিয়াছিলাম। আমার ও ব্রজেন্দ্রবাবুর উভয়েরই নিদ্রাকালে উচ্চ নাসিকাধ্বনি হইত। গভীর রাত্রিতে বাহিরে যাইবার প্রয়োজনে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম মহারাজা দুই হাত গণ্ডদেশে স্থাপন করিয়া চুপ করিয়া শয্যার উপরে বসিয়া আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "দুই পাশের এত শব্দে কি ঘুম আসে ?" লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া আমি প্রস্তাব করিলাম, আর কোন তাঁবুতে গিয়া ঘুমাই ; কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগরণের ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া সেই পরম সহিষ্ণু পুরুষ কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আর এক দিনের ঘটনা বলি ;—মহারাজার পছন্দসই একটী নবক্রীত বহুমূল্য পরিচ্ছদের ভিতরে সীতানাথ নামক তাঁহার জনৈক খানসামা কি ভাবিয়া একটী ফুললতেলের বোতল রাখিয়া দেয়, এবং পরে দৈবক্রমে ঐ বোতল ভাঙ্গিয়া গেলে পরিচ্ছদটা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সক্রোধে আমি কহিলাম, "লোকটাকে এই মুহূর্ত্তে বিদায় করে দেওয়া উচিৎ", শুনিয়া দয়ার অবতার মণীন্দ্রচন্দ্র ধীরে কহিলেন, "তাইত, বিদায় দিলে যাবে কোথায়, খায় কি ?" আরও একদিন, তাঁহার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময় তাঁহার ফরাসখানার দারোগা তারকবাবু আসিয়া অভিযোগ করিলেন, "দেখুন, বড় ঝাড় তাঁহার বৃদ্ধ ফরাস ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ;" শুনিয়া বিচারক মহারাজা কহিলেন, "দেখুন, আগে খোঁজ নিন, যদি তার অসাবধানতার জন্য ঝাড় ভেঙ্গে থাকে তবে তার শাস্তি

পাওয়া উচিত, নইলে পৃথিবীতে কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়, আপনিও চিরকাল থাক্‌বেন না, আমিও চিরকাল থাক্‌ব না, একটা ঝাড় যদি গিয়ে থাকে, কি আর কর্ব্ব ?" এই জাতীয় ঘটনা কতশত ঘটিয়াছে, তাঁহার দেবোপম চরিত্রের কত দিক কত ঘটনায় যে স্ফূরণ হইয়াছে, লিখিয়া তাহার কত শেষ করিব ?

বহরমপুরের জনসাধারণ কোন বিষয়ে অত্যন্তাভাব বোধ করিতেছে, এ কথাটা শুনিতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না ; ইহা তাঁহার পক্ষে চিরদিন অসহনীয় ছিল। তাঁহার প্রাণপ্রিয় বহরমপুরের জন্য তিনি দুই লক্ষ আশী হাজার টাকা ব্যয়ে জলের কল স্থাপন করিয়া দিলেন, বহরমপুরের বালকদিগের শিক্ষালাভের জন্য এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা দিয়া কলেজিয়েট্ স্কুলের সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি বহরমপুর কলেজে প্রতি বৎসর বহু হাজার টাকা দান করিতেন, বহরমপুরের বালিকাদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত মহাকালী পাঠশালার যাবতীয় ব্যয়ভার নিজস্কন্ধে বহন করিলেন, করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, সৈদাবাদ লর্ড হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় বহু ব্যয়ে স্থাপিত করিলেন, খাগড়ায় লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর স্কুলের নূতন বাটী প্রস্তুতকালে প্রভূত অর্থ সাহায্য করিলেন, বহরমপুর আদর্শ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাণরক্ষাকল্পে মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য করিতে লাগিলেন, এইরূপ আরও কতশত—কত বলিব ? কিন্তু বহরমপুরের কথা স্বতন্ত্র, বাঙ্গলাদেশের কয়টা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সাহঙ্কারে বলিতে পারে যে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের সাহায্য ব্যতীত আজও বাঁচিয়া আছে ? বৃহত্তর বঙ্গেরই বা কোন অংশ দর্পভরে বলিতে পারে যে, অভাবে এই দানবীরের নাম একবারও স্মরণ করে নাই ? মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, শিক্ষার জন্য তিনি এক কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু আমি জানি,

প্রকাশ্যে ও গোপনে এই দানের পরিমাণ দুই কোটীর বড় বেশী ন্যূন নহে।

উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষা ব্যতীত যে এই অধঃপতিত জাতির পুনরভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পন্থা নাই, এই মহাসত্যটা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহা জীবনে নিমিষের জন্য বিস্মৃত হন নাই। তাই সমগ্র দেশব্যাপী শিক্ষাপ্রসারের জন্য সেই অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের এই অসামান্য দান, এত প্রচেষ্টা, এত উৎকণ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণস্পর্শী সখেদোক্তি—"বাঙ্গালার ইতিহাস নাই" যেন মূর্ত্ত হইয়া তাঁহার কর্ণে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিধ্বনি করিয়া যাইত, লজ্জায় তিনি অধোবদন হইতেন। তাঁহার ও তাঁহার জাতির—হিন্দুমুসলমান সংগঠিত বাঙ্গালী জাতির এই লজ্জা অপনোদনের জন্য তিনি বহুব্যয়ে প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, প্রাচীন চিত্রাবলী প্রভৃতি ইতিহাসের উপকরণগুলি দেশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতেন, এবং তাহার কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে সদ্ব্যবহারের আশায় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলনের পুণ্যোৎসব তাঁহারই যত্নে কাশিম বাজারে তাঁহারই প্রাঙ্গণে তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং সেই পরমোৎসব যাহাতে প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানে সমাধা হয়, যাহাতে বাঙ্গালার সারস্বত কুঞ্জের একনিষ্ঠ সাধকগণ বৎসরে বৎসরে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন, তাহার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়া বঙ্গবাসীমাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পবিত্র মন্দির, সেও ত বঙ্গভাষার একান্ত অনুরক্ত সেবক মণীন্দ্রচন্দ্রেরই প্রদত্ত ভূমিতে দণ্ডায়মান, তাঁহারই অর্থে পুষ্ট। নিজের জ্ঞান পিপাসাও তাঁহার বড় একটা কম ছিল না, তাঁহার পারিবারিক বিরাট গ্রন্থাগার হইতে

অবসর পাইলেই পুস্তক বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তক লইয়া অধ্যয়ন করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন।

কিন্তু দানই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। দেখিয়াছি দান করিয়া তিনি একটা তৃপ্তি পাইতেন, একটা আনন্দ অনুভব করিতেন। সে তৃপ্তির, সে আনন্দের স্বরূপ বুঝাইবার সাধ্য নাই, কিন্তু তাহার একটা পরিস্ফুট ছায়া যখন চোখে মুখে ভাসিয়া উঠিত, তখন বুঝিতাম এ আনন্দে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই, এ এক শুভ্র আনন্দ, অনাবিল, অপার্থিব আনন্দ, যাহা যিনি হিসাব করিয়া দান করেন না, বিচার করিয়া দান করেন না, যে দাতা দানের সময় জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, বয়স প্রভৃতির কোনই প্রশ্নই উত্থাপন করেন না—তিনি ভিন্ন সংসারে অপর কাহারও উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। প্রার্থী, যাচক, অথচ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের দ্বারে প্রত্যাখ্যাত এরূপ লোক আছে কিনা জানি না, থাকিলেও অতি বিরল।

কাঙ্গালী-ভোজন করাইতে তাঁহার যে কি অপরিসীম আগ্রহ ছিল, তাহা বর্ণনাতীত। মনে পড়ে, ১৩০৭ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র মহিমচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে কাঙ্গালী ভোজনের সময় তাঁহার স্বহস্তে সংখ্যাতীত কাঙ্গালিগণকে পরিবেশনের কথা; ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেলার পর বেলা পরিবেশন করিয়া যাইতেছেন—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, কার্পণ্য নাই,—দেখিয়া বিদেশাগত নিমন্ত্রিত ধনী সম্প্রদায় অতীব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন। মনে পড়ে, ১৩১১ সালে তাঁহার মাতামহী রাণী হরসুন্দরীর দানসাগর শ্রাদ্ধ। ন্যূনাধিক ষাট হাজার কাঙ্গালীর সমাবেশের কথা; মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, নদীয়া মালদহ রাজসাহী, প্রভৃতি দূরদেশ হইতে কাতারে কাতারে কাঙ্গালী আসিতেই লাগিল, এবং আসিয়া প্রত্যেকে

একটাকা নগদ, একখানি কাপড়, একসের চাউল, এক সরা চিড়ে মুড়কী, চারিখানা লুচি ও চারিটী বিভিন্ন প্রকারের সন্দেশ প্রাপ্ত হইয়া আর্ত্তের বন্ধুর জয়গান করিতে লাগিল; সেবারে ভিড় এতই হইয়াছিল, যে ক্ষীণ ক্লিষ্ট পাঁচজন কাঙ্গালী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং আটজন গর্ভবতী রমণীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যায়। এই বিরাট ক্রিয়া উপলক্ষে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় দেওয়ার ভার ছিল স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের উপর, এবং পূর্ণ-বিদায়ের পরিমাণ ছিল এক শত এক টাকা।

ধর্ম্মে তাঁহার কিরূপ অশেষ ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল, তাহাও আজ নূতন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতরে কালক্রমে যে ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছিল তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত সেই পরম ভাগবত আজীবন আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং অন্ততঃ কতকাংশে যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রতিবৎসর বৈষ্ণব সম্মিলনীর উৎসব তাঁহার ভবনে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। মনে পড়ে, উৎসবান্তে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীবিগ্রহ লইয়া তাঁহার বাটী হইতে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া প্রখর আতপদগ্ধ পথে ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজা নগ্নপদে, অনাবৃতমস্তকে, কত আগ্রহে, কত উৎসাহে, কেমন করিয়া সমগ্র বহরমপুর সহর পরিক্রম করিয়া আসিতেন। তদ্ব্যতীত, খড়দহ, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থে বৈষ্ণব সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব ক্রিয়াও তিনি প্রভূত অর্থব্যয়ে সম্পন্ন করিতেন।

"অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ" এই প্রবাদ বাক্য মহারাজার সম্বন্ধে ব্যর্থ—শতধা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। সফল যে কথাটী হইয়াছিল, তাহা "রাজর্ষি"। জন্মান্তরের সুকৃতি যদি তাঁহার রাজার

ঐশ্বর্য্য, বৈভব ও প্রতিষ্ঠার বিধান করিয়াছিল, ঋষির চরিত্র বল, ঋষির সহিষ্ণুতা, ঋষির শম, দম ও তিতিক্ষা—এগুলি আগে বিধান করিয়াছিল। অহমিকা রাজর্ষি মণীন্দ্রচন্দ্রের মনকে স্পর্শও করিতে পারে নাই—তাহার ত্রিসীমায়ও আসিতে পারে নাই। তাই, নিতান্ত নগণ্য পর্ণকুটীরবাসীও তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিবার স্পর্দ্ধা রাখিত, কারণ সে জানে সেই নিরহঙ্কার প্রতিমূর্ত্তির নিকট প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা নাই; নিতান্ত নিঃস্বও তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া বহুক্ষণ নিঃসঙ্কোচে আলাপন করিবার সাহস রাখিত, কারণ সে জানে, সেই শুভ্রাসনে আকিঞ্চন বলিয়া তাচ্ছিল্যের কোনও সম্ভাবনা নাই।

এখানে একটা কথা বলিব, তাঁহার উপাধিগুলি প্রাপ্তির কথা। এই রহস্যময়ী ধরণীর যত রহস্য আছে, 'উপাধি' নামক রহস্যটি বুঝিতে পারি না কেন, যাঁহারা তাঁহার জন্য লালায়িত, তাঁহাদের অনেকের নিকট স্পর্শভয়ে পলায়ন করে, আর যাঁহারা তাহাকে সর্ব্বদা পরিহার করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের অনেকেরই কণ্ঠে আসিয়া দিনে দিনে আলিঙ্গন করে। কারণ যাহাই থাক্, মহারাজা এই আলিঙ্গনের তীব্র জ্বালায় জ্বলিতে কদাপি কামনা করেন নাই, অথচ তাঁহার গুণমুগ্ধ সরকার বাহাদুর এবং ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ও জনসাধারণ তাঁহার উপর স্নেহের অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে এই আলিঙ্গনে বদ্ধ হইতে বারে বারে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাঁহারা মহারাজার ভিতরকার প্রকৃত মানুষটাকে সম্যক্ চিনিতে পারেন নাই, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য, কিন্তু আজ তাঁহারাও জানিয়া রাখিতে পারেন, অন্তিম শয্যায় যখন মৃত্যুকালিমা তাঁহার চোখে মুখে বুকে ঘনাইয়া আসিতেছিল, যখন তাঁহার পার্থিব কণ্ঠ চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তখনও তিনি তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান শ্রীশচন্দ্রকে

উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, **"অযথা নামের জন্য অর্থব্যয় করিও না"** ।

যাহাই হউক, খৃষ্টীয় ১৮৯৮ সালের ৩০শে মে তারিখে (বাং ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) তিনি "মহারাজা" খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার অসীম গুণবত্তার উত্তরোত্তর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে, মহামান্য ভারত-সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে, ৩রা জুন তারিখে, সরকার তাঁহার প্রতি অত্যুচ্চ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত তাঁহাকে "কে, সি, আই, ই" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই উপাধি মহারাজার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে, কি মহারাজার আশ্রয় পাইয়া তাহারই মর্য্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে, সে বিচার আজ নাই করিলাম, কিন্তু বিদেশী সরকারও ত তাঁহার গুণের তারিফ্ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশান্ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত, এবং পুনরায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর (সদস্য) ছিলেন ; ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গদেশ ও আসাম বিভাগ হইতে মনোনীত সদস্যরূপে ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশান্ পুনরায় তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়া মেম্বররূপে কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্ এ প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এই যাবতীয় সময়েই তিনি "অনারেবল্ মহারাজা" বলিয়া অভিহিত হইতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "অনারারী ফেলো" নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট বিপুল ঋণের কথঞ্চিৎমাত্র পরিশোধ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, বঙ্গাব্দ ১৩১৫ সালে বৈষ্ণব গোস্বামী প্রভুগণ প্রদত্ত "শ্রীগৌড়রাজর্ষি" ও ১৩১৬ সালে প্রদত্ত "ধর্ম্মরাজ" উপাধি, ১৩১৭

সালে কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তি প্রদায়িণী সভা কর্তৃক প্রদত্ত "ভক্তিসাগর" উপাধি, ১৩২০ সালে নবদ্বীপ বুধমণ্ডলী কর্তৃক প্রদত্ত "বিদ্যারঞ্জন" উপাধি, ১৩২২ সালে কাশীস্থ ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডল কর্তৃক অর্পিত "ভারত-ধর্ম্ম ভূষণ" উপাধি, ১৩২৬ সালে পুরী বেদ-বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত "দান কল্পতরু" উপাধি—তাঁহার অপরাপর উপাধির মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই শাপভ্রষ্ট দেবতাকে অনেকানেক মর্ম্মান্তিক শোক তাপও ভোগ করিতে হইয়াছে। উপর্য্যুপরি প্রাণ-প্রতিম দুই পুত্রের অকালমৃত্যু ও দুই কন্যার বালবৈধব্যে তাঁহার স্নেহাতুর পিতৃহৃদয়ে হাহাকারের সর্ব্বগ্রাসী আগুণ শতজিহ্বায় প্রতিবারেই দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অথচ, পরমাশ্চর্য্যের বিষয়, সেই আত্মস্থ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সংযমের বন্যা ডাকিয়া প্রতিবারেই তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উপরন্তু, আরও আশ্চর্য্য এই, পরিবারের অন্যান্য সকলকেও শোকের প্রথম আতিশয্যের সময়েও নিজের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত করিতে সচেষ্ট হইতেন। ১৩১০ সালে মধ্যমকুমার কীর্ত্তিচন্দ্রের দেহাবসান ঘটে, তাঁহার মুখাগ্নি হইতে যাবতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতা স্বহস্তে সম্পাদন করিয়া তাঁহার অসীম চিত্ত-সংযমের পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৩১৩ সালে যখন তিনি সপরিবারে, ৪০০।৪৫০ পরিবার সহ ব্রজপরিক্রমা করিতেছিলেন, তখন শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতে জ্যেষ্ঠকুমার মহিমচন্দ্র ভীষণ টাইফয়েড্ রোগে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তখনও মহারাজার মনের অদ্ভুত দৃঢ়তা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। প্রথমা কন্যা অতি অল্পবয়সে, এবং দ্বিতীয়া কন্যা বিবাহের মাত্র ৮ মাস পরে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়েন, আনন্দের প্রতিমা বালিকা কন্যাদ্বয়ের উপর বিধাতার এই নির্ম্মম অভিসম্পাতের জন্য

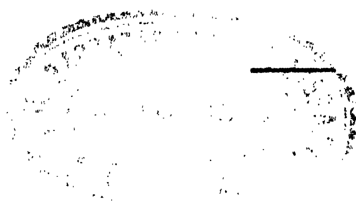
মহারাজার পুঞ্জীভূত ব্যথা-ক্লিষ্ট অন্তর প্রতিনিয়তই তপ্ত-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিত, অন্দরে যাইবার পূর্ব্বে বুক তাঁহ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিত—পা চলিত না, দেহ অবসন্ন হইয়া আসিত—আর যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করিতেন বক্ষের সেই গুরু কম্পন অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিত—কিন্তু এজন্য কখনও তিনি আত্মহারা হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই, কন্যাদিগের দুর্দ্দশার জন্য তাঁহার নিজকৃত কোন অজানা পাপই দায়ী—এই বিশ্বাসে মঙ্গলময়ের বিধানের বিরুদ্ধেও কখন অভিযোগ প্রকাশ করেন নাই।

গত আশ্বিন মাস হইতে তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় বার জ্বর ভোগান্তে আমাদের নিকট গল্প করেন, "দেখুন, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, আমার দাদা (৺উপেন্দ্র বাবু) হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলেন, আমি বল্লাম, 'দাদা, এ রাজ্যভোগ তোমার, তুমি নাও, আমার এ ভাল লাগে না'—দাদা হেঁসে উত্তর দিলেন, 'না তুমিই ভোগ কর'।" মৃতজনের সহিত স্বপ্নে সাক্ষাৎকার, ও এবংবিধ কথোপকথনের কথা শুনিয়া উপস্থিত আমাদের সকলেরই মনে স্বতঃই কেমন খট্‌কা লাগিল। কিন্তু তখনও বুঝি নাই—ভাবি নাই—ভাবিতে পারি নাই, যে সংসারে উদাসীন, রাজ্যভোগে বীতস্পৃহ এই যোগীন্দ্র এইভাবে তাঁহার অন্তিমের আভাস দিয়া এত শীঘ্রই তাঁহার অগ্রজের, পুত্রদ্বয়েব ও জামাতাদ্বয়ের সহিত পরলোকে চিরমিলনাকাঙ্খায় মহাপ্রয়াণ করিবেন।

তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ সাধ অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার আদরিণী পৌত্রীটীকে বিবাহ দিয়া যাইতে পারিলেন না। ইদানীং তাঁহার কথাবার্ত্তায় মনে হইত আগামী মাঘ ফাল্গুনের মধ্যেই, পৌত্রীটীকে সৎপাত্রস্থা করিতে পারিলেই তিনি যেন আন্তরিক সুখী হন।

* * ৺কাশীমিত্রের ঘাটে সেই পরমহিতৈষী, পরমবন্ধু, পরমাত্মীয়ের শান্ত সুন্দর দেহটা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে—ভাবিতে পারি না—কিন্তু গিয়াছে, ভস্মে সেই নশ্বর দেহটার সত্য সত্যই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। * * ইহলোকে সেই মহিমময় আত্মা মানবজাতির প্রতি যে অফুরন্ত শুভেচ্ছা প্রতিক্ষণে জ্ঞাপন করিত, তাহা দেশে দেশে, যুগে যুগে প্রতি মানবের অন্তরে অন্তরে নিবিড় হইয়া উঠুক।

(উপাসনা হইতে উদ্ধৃত)



পরলোকে কাশিমবাজারের মহারাজা

[শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র]

*　*　*　*

কাশিমবাজারের মহারাজা, মহারাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয়, মহারাণী স্বর্ণময়ী নণীন্দ্রচন্দ্রের মাতুলানী। ইঁহার পিত্রালয় শ্যামবাজারে ছিল, বাল্য ও যৌবনের প্রারম্ভ সেই বাটীতেই কাটাইয়াছিলেন। তিনি বিরাট জমিদারীর উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু বাল্যকালে সুখ সম্পদের মুখ দেখিতে পান নাই। তিনি যখন হেয়ার স্কুলে পড়িতেন তখন আমরা দেখিয়াছি, তিনি সামান্য বেশেই বিদ্যালয়ে আসিতেন, দরিদ্র ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময়ে তিনি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অতি সামান্য অর্থই পাইতেন, সুতরাং দরিদ্রের যে কিছু ক্লেশ তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার যেরূপ শাদাসিদে পোষাক ও চালচলন ছিল উত্তর কালেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই! দরিদ্রতার মহৎ শিক্ষা তাহার জীবনকে গঠন করিয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর তিনি কাশিমবাজারের জমিদারী লাভ করেন।

গত ৩২ বৎসরে এই জমিদারী হইতে তিনি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই এক কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। অর্থকরী শিক্ষা, ব্যবসায় স্থাপন, সৎসাহিত্যের প্রচার ও বিদ্যানুশীলনের জন্য তিনি অকাতরে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

অনেক উচ্চশ্রেণীর গবেষক ও গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী ১৯১০ খৃঃ অব্দে মহারাজার কাশিমবাজারস্থিত রাজবাটীতেই প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা এখন প্রতি বৎসর বঙ্গদেশের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গৃহের স্থান তাঁহারই দান।

প্রসিদ্ধ বেঙ্গলী সংবাদপত্র যখন মুমূর্ষু তখন তিনি তাহার একজন প্রধান স্বত্বাধিকারী হইয়া উহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গলীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি এবং রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কের সংস্থাপন কর্ত্তা। বাঙ্গালাদেশে চীনামাটির বাসন তৈয়ারীর সর্ব্বপ্রকার উপাদানই আছে কিন্তু উৎসাহ ও অর্থের অভাবে বাঙ্গালা দেশের কেহই চীনামাটীর দ্রব্য তৈয়ার করিতে অগ্রসর হয় নাই। বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্ তাঁহার এক মহৎ কীর্ত্তি। বাঙ্গালা দেশের অনেক ছাত্রই গরীব। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষা প্রদান করিলে অনেক বালক ছাত্রাবস্থাতেই উপার্জ্জনশীল হইয়া বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি বাগবাজারে পলিটেকনিক স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

দেশে শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা ও বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। বহু দেশীয় কোম্পানীর সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

তিনি গত ১৫ বৎসর যাবৎ বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। নূতন শাসনতন্ত্র আরম্ভ হইলে তিনি কাউন্সিল অব ষ্টেটে বঙ্গীয় জমিদারের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

মহারাজের ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি বিখ্যাত ধর্ম্মকার্য্যের জন্য তাহার দান সামান্য নহে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি বহরমপুরের বাঞ্জেটিয়া নামক স্থানে শিল্প-প্রদর্শনীর বৃহৎ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বহু বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এমন বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে তাঁহার জমিদারীর বাহিরে যে কেহ তাঁহাকে বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় নিমন্ত্রণ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তথায় গমন করিতেন এবং অর্থ দান করিয়া আসিতেন।

তিনি যে কত সহস্র দরিদ্রের মা বাপ ছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, দরিদ্রেরা আজ যথার্থই পিতৃমাতৃহীন হইল। তিনি যথার্থই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দান করিতে করিতে তাঁহার কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়াছিল। কেবল কুবেরের ভাণ্ডার নিঃশেষ করেন নাই, বহু লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই ঋণ শোধের জন্য গিলাণ্ডার আরবুথনট কোম্পানীর হস্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহাতে তাহার মনে এই সান্ত্বনা ছিল যে জন্মভূমিকে নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাইবার এবং লোকের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্যই পরের হস্তে জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়াছেন।

কলিকাতার দরিদ্র রোগীগণ বিনা চিকিৎসায় অনেক সময় মারা যায়। মহারাজা "গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাভবন" স্থাপন করিয়া বিশুদ্ধ কবিরাজী ঔষধ দানের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বহরমপুর কলেজ আগে গবর্ণমেণ্ট কলেজ ছিল। গবর্ণমেণ্ট যখন উহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন তখন মহারাণী স্বর্ণময়ী উহার ভার গ্রহণ করেন এবং অবশেষে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী উহার জন্য বহু লক্ষ টাকা

ব্যয় করেন। মহারাজা যে কেবল প্রাচীন বহরমপুর কলেজ রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, ঐ কলেজে ব্যবসা বাণিজ্য ও উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষার এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন, যাহা অন্য কোন কলেজে নাই। বাঙ্গালী-দিগকে বিদ্যাদান ও অর্থশালী করাই মহারাজার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

সম্প্রতি ম্যালেরিয়া কমিশন বহরমপুর গিয়াছিলন, তখন তাঁহার জর ছিল। এই জর লইয়াই তিনি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়েন।

* * * *

মহারাজার যোগ্যপুত্র শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী তাঁহার পিতার জীবনের বিশুদ্ধতা অবলম্বন করিয়া স্বর্গগত আত্মার আনন্দবর্দ্ধন করিবেন।

সঞ্জিবনী, ১১ই নভেম্বর—



মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র

বাঙ্গালার স্বর্ণচূড়া খসিয়া পড়িল। বাঙ্গালীর গর্ব্ব, বাঙ্গালীর মান, বাঙ্গালীর আপনার হইতে আপনার বলিয়া অহঙ্কার করিবার যাহা কিছু কালের অমোঘ দণ্ডাঘাতে তাহা ধূল্যবলুণ্ঠীত হইল। সৌজন্য ও বিনয়ের অবতার, নিরভিমান, নিরহঙ্কার, সাহিত্য ও সমাজের অকৃত্রিম সুহৃদ, দরিদ্র আতুরের বন্ধু, বিদ্যার্থীর সহায়, স্বজন প্রতিপালক, স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দানবীর মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সপ্ততিতম বর্ষ বয়সে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীজাতিকে বিয়োগ ব্যথায় অভিভূত করিয়া গত সোমবারে তাঁহার সারকুলার রোডস্থ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীজাতি আজ যে অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হইল, তাহা কোন অজানা ভবিষ্যতে পূর্ণ হইবে? * * *

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র প্রথম বয়সে সাধারণ গৃহস্থের জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখনও যে মাসহারা পাইতেন, তাহা হইতেও তাঁহার দ্বারা অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন হইয়াছে। রাজতক্তে সমাসীন হইবার পর প্রথম জীবনের সেই মহৎ প্রবৃত্তি বিন্দুমাত্র লুপ্ত হয় নাই, বরং তখন তাহা শত গুণ তেজে প্রজ্জলিত হইয়াছিল। সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে দান তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার জীবনে আর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম বয়সে তিনি যেমন সহজ আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিয়াছিলেন, রাজতক্তে আসীন হইয়া যখন তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, তখনও সেইরূপ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সৌম্য প্রসন্ন মূর্ত্তির বিকৃতি কেহ কখন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। * * *

তাঁহার সৌজন্য, বিনয় ও সামাজিকতা এখনকার কালে দৃষ্টান্তের স্থল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তিনি স্বয়ং বাণীর একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ এ জন্য বৃথা গর্ব্ব অভিমানে উৎফুল্ল হইয়া ভদ্রতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে দেখে নাই। দেশের শিল্প-বাণিজ্য সাহিত্য আদির উৎকর্ষসাধনে তাঁহার আন্তরিক উৎসাহ আগ্রহ ও দান প্রবৃত্তি উপমার স্থল ছিল, অথচ সে জন্য কখনও তাঁহাকে কেহ বৃথা গর্ব্বে স্ফীত হইতে দেখে নাই, উহাতে তিনি যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, তাহা সঙ্গোপনে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলে লুক্কায়িত থাকিত, ধনি-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খনির্ব্বিচারে আমন্ত্রিত অভ্যাগত তাঁহার রাজপ্রাসাদে সমান সমাদর প্রাপ্ত হইত, মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকলকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া পান-ভোজন করাইয়া আপ্যায়িত করিতেন।

হিন্দুধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠা—বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মে অচলা ভক্তি মহারাজার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যে কেন্দ্রে তিনি বিচরণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার ভিন্নরূপ হওয়াই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরম অনুরক্ত দীনাতিদীন ভক্ত ছিলেন, তাই তিনি তাঁহার আদর্শের অমূল্য বাণী 'তৃণাদপি সুনীচেন' কথাটীকে নিজ জীবনে সার্থকতা দান করিয়া গিয়াছেন। শান্তিপুর ও নবদ্বীপে যাহারা তাঁহাকে অসংখ্য ভক্তমণ্ডলীর সহিত নগ্নপদে কীর্ত্তনানন্দে মাতিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, এই মানুষটির মন কি ধাতুতে গঠিত ছিল। তাঁহার প্রেমানন্দে মত্ততার মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। হিন্দুর সকল সদনুষ্ঠানে তাঁহার মুক্তহস্তে দানের কথা সকলেরই সুবিদিত।

ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে অনুষ্ঠানে ভোগবিলাসবেষ্টিত রাজ্যেশ্বর হইয়াও তিনি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন এবং সাধারণকে আনন্দ বিতরণ করিতেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ

কোমল ব্যবহারের ফলে যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মানুষের পক্ষে ইহার অধিক সুখ্যাতির কথা আর কি হইতে পারে জানি না। রাজ্যেশ্বরের পক্ষে অনাড়ম্বর ও নিরহঙ্কার হওয়া যে কত বড় গুণের পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

মানুষের জীবনে যে গুণ থাকিলে মানুষ প্রকৃত 'মানুষের মত মানুষের' পদবী প্রাপ্ত হয়, যে গুণলাভ জন্মজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রে তাহারও অভাব ছিল না। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অবস্থায় মানুষ পরের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হয়, ভাগ্য পরিবর্ত্তনের ফলে সে যখন রাজ্যেশ্বর, তখন সে উপকারের কথা প্রায়ই বিস্মৃত হয়। মহারাজকে কেহ কখনও এই অপরাধে অপরাধী করিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রথম জীবনের পরিচিত কত লোক যে তাঁহার সৌভাগ্যো-দয়কালে তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যেখানে উপকারের প্রত্যুপকার করার প্রয়োজন হয় না, সেখানেও তাঁহার ব্যবহারের কথা শুনিলে আনন্দরসে মন আপ্লুত হয়। একটা দৃষ্টান্ত এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পরলোকগত মুনসেফ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের প্রথম বয়সে গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি যে সময়ে বহরমপুরের প্রথম মুনসেফের পদে সমাসীন, তখন মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজারের রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন। একদিন মুনসেফ বাবুর কোনও নিকটাত্মীয় যুবক তাঁহার বাসায় বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, মুনসেফ বাবু কাছারী গিয়াছেন, এমন সময়ে একজন বিগত যৌবন ভদ্রলোক সদরে পদার্পণ করিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 'মা, মা, আমার মা কোথায় গেলেন?' বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া একবারে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবক

বিস্মিত! এই অপরিচিত লোক অনুমতি না লইয়াই অন্দরে অগ্রসর হয় কোন সাহসে! সে দৌড়াইয়া বাধা দিতে গেল। লোকটি হাসিয়া বলিল, "বাঃ! মার কাছে যাচ্চি খেতে, তুমি বাধা দেবার কে হে ছোকরা? মা মা!" এমন সময়ে সদ্যোনিদ্রোত্থিত গৃহিণী ভিতর হইতে বলিলেন, "কে ডাকছে আমায়?" বলিয়া আগন্তুককে দেখিয়াই শশব্যস্তে বলিলেন, "এস বাবা, এস" তাড়াতাড়ি আসন দিবার ধুম পড়িয়া গেল। লোকটি কিন্তু সটান সানের মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া আবদারের সুরে বলিল, "ওসব থাক, কি খেতে দেবে বল দিকি? অনেক দিন তোমার হাতের রান্না খাইনি মা।" যুবকটি তাহার পর যখন পরিচয় পাইল যে তিনি কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, তখন সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

এই যে গুরুপত্নীর প্রতি জননীর মত ব্যবহার, তাঁহার নিকট আড়ম্বর শূন্য অহমিকাশূন্য আহারের আবদার, ইহার মিষ্ট ব্যবহারের ও সম্বন্ধের তুলনা অধুনা কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? কবে বাল্যকালে কাহার নিকট কিছুদিনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সেদিনের কথা মহারাজা সৌভাগ্য-সম্পদের দিনে ত একবারও বিস্মৃত হন নাই! ইহাই মহত্ত্ব, ইহার তুল্য মানুষের মধুর চরিত্র আর কি অঙ্কিত হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র ভূতলে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। তিনি ত বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর হৃদয় জুড়িয়া অধিষ্ঠান করিবেনই। কিন্তু বাঙ্গালী যদি তাঁহার মত সামাজিক, জনহিতব্রত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও দানবীর হইতে শিক্ষা করে, তবেই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সার্থকতা সম্পাদিত হয়।

* * * * * *

দৈনিক বসুমতী, ১৩ই নভেম্বর। ১৩৩৬—

মনুষ্যত্বের মহাতাপস মণীন্দ্রচন্দ্র !

(কলিকাতা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে মুর্শিদাবাদ সম্মিলনী কর্ত্তৃক আহুত শোক-সভায় পঠিত।)

তোমার জীবনকালে চিরস্মরণীয় পবিত্র স্মৃতি মৃত্যুতে অমর হইয়া রহিল। তাহার পূজার জন্য কোনও আয়োজন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই ;—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্যে তোমার অলোকসামান্য চরিত্র, অনন্যসাধারণ কর্ম্মের যে জীবন্ত স্মৃতি—নূতন করিয়া তাহার কি উদ্‌যাপন করিব ? তোমার মৃত্যু তোমার চারিদিকে যে অনন্ত অবকাশ রাখিয়া গেল তাহা আজ সমগ্র জাতিকে নূতন করিয়া তোমাকে চিনিবার সুযোগ দিয়াছে। তোমার স্মৃতি আজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মত জনসাধারণের নিকট হইতে পূজার অর্ঘ্য লইয়া ধন্য করিতেছে।

রাজার অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তুমি ত্যাগ-ব্রতকে জীবনের পরম সাধনা করিয়াছিলে—সহস্র নরনারীর হৃদয়কমলে তাই তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত—আজ নিদারুণ বিয়োগ-দুঃখের মধ্যে তোমাকে স্মরণ করিয়া দেখিতেছি যে দেহাবসানে তোমার কীর্ত্তি আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—বিপদে আশ্রয় দিয়াছ, সম্পদে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছ ; দুঃখে কাঁদিয়া, সুখে হাসিয়া তুমি পরমাত্মীয়ের মত মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধকে গভীর হইতে গভীরতর করিয়া গিয়াছ—তোমাকে বস্তুজগতে যে হারাইলাম, আমাদের কল্যাণ-কর্ম্মে, সামাজিক অনুষ্ঠানে, রাষ্ট্র-সমস্যায় যে তোমাকে আর আমাদের মধ্যে অগ্রণীরূপে দেখিতে পাইব না—এই অনুভূতিই আজ বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে।

হে মহাপুরুষ! দুর্ভাগা জাতির সহস্র অভাব ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে, অনন্ত দারিদ্র্য ও অসীম দুঃখ বেদনার মধ্যে, অনশনে ক্ষীণ, অশিক্ষায় দীন, অজ্ঞতায় পরাধীন বাঙ্গালার জনসমাজে তোমার অনির্ব্বাণ দানযজ্ঞের বহ্নি-শিখা আজ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেখানে তুমি মনুষ্যত্বের মহা-তপস্যায় নিজের অজ্ঞাতে নিজে এমনি একটা স্থান করিয়া গিয়াছ যে সেখান হইতে তোমার নিত্য পূজার শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইতেছি।

দুর্দ্দিনের পরম বন্ধু! অবিরাম ধারাবর্ষণ, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দুর্গমপথে নিরুপায় পথযাত্রীর পরমশরণ ছিলে তুমি,—বিপদ তোমাকে বিচলিত করে নাই, নিষ্ফলতা তোমাকে অবসন্ন করিতে পারে নাই; সমুন্নত মস্তকে তুমি মানুষের আদর্শপথে আপনার বলে আপনার পথ করিয়া গিয়াছ; সেখানে তোমার পদচিহ্নের সঙ্গে তোমার জীবনের অনুপম মধুর স্মৃতিটুকু জড়াইয়া আছে—আগত ও অনাগত জীবন-যাত্রীর দল সেই লক্ষ্যেই আপনার পথ করিয়া লইবে—এই অসহনীয় দুঃখের মধ্যে এই টুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

তুমি যে রাজা সেকথা তুমি কোনও দিন কোনও কারণে কাহাকেও জানিতে দেও নাই। হে মনুষ্যত্বের মহাতাপস! রাজত্বে রাজার অধিকার, তুমি তোমার দেবদুর্লভ চরিত্রবলে আমাদের হৃদয়-রাজ্য চিরদিনের জন্য জয় করিয়া গিয়াছ। মণিরত্ন রাজার কাম্য, তুমি ছিলে রাজরাজেশ্বর,—বিশ্বের রাজপথে ক্ষুদ্র মহতের সহিত তোমার নিত্য মিলন দেখিয়াছি, তাই সহস্র হৃদয়-পদ্মে বিরচিত অম্লান বিজয়মালিকায় একমাত্র তোমারি অধিকার থাকিয়া গেল—তোমায় কোটি কোটি নমস্কার!

স্বায়ত্ত-শাসন, ১৩শ সংখ্যা।

PARTITION OF BENGAL

Late Maharaja Manindra Nandi's Speach.

Delivered on 8th August 1905.

Gentlemen, My, presence here this evening and my occupation of the presidential chair of this great meeting is significant in more ways than one. It shows that we of West and Central Bengal are in deep sympathy with our brethren cf East and North Bengal and that we are resolved to make common cause with them in averting what I have no hesitation in describing as the greatest calamity which has befallen the Bengali-speaking race since the commencement of British rule. The old emasculated province of which we shall be a part, will suffer even more than the newly formed province. Among the six divisions of the old province, there will be only a division and a half containing a Bengali-speaking population. We shall be in a hopeless minority and the prospects of public employment of our people will dwindle in proportion of our numerical insignificance. In the province the Mohamedan population will preponderate; and in the old province the Bengali Hindoos will be in a minority. We shall be stronger in our own land. I dread the prospect and the outlook fills me with anxiety to the future of our race. Considerations of administrative convenience must always have their due weight with statesmen. But far important to them is the good-will of the governed as an essential factor for the purposes of a wise and even efficient administration. Geometrical symmetry in administrative divisions may be desirable best as the

"Englishman" pointed out with convincing force (and here on your behalf let me convey to the "Englishman" and "Statesman" newspapers the thanks of the entire Bengali community for their sympathy with us in our great national misfortune) that the French revolutioneries found to their cost that their old administrative divisions served them better than their new fangled departments; for the old divisions engaged the sympathies and affections of the people and appealed to their long-cherished associations. The partition of Bengal will rend asunder the ties of centuries, break up associations which are a part of our being, and, I fear, and may, even alienate the sympathies of the people from the Government. Is administrative efficiency possible under these conditions? For is not the co-operation of the people and the Bengalees can render important assistance to their rulers—essential to such efficiency? And if administrative efficiency more to be gained by partition, is it desirable to make so heavy a sacrifice even for such a purpose? For let it never be forgotten, that great and inexhaustible as may be the military resources of British power the good will of the people is the strongest bulwork of British rule in India. Even the Greatest Military commander of the age Lord Roberts, who may be supposed to be inclined to exaggerate the importance of military strength holds this view. Nobody will question my loyalty. My house has been associated with the genesis of British rule. The founder of my family was a friend of Warren Hastings and on a critical occasion saved his life. I feel that I have a hereditary right to advice the government. And speaking with a solemn sense of responsibility as the representative of a

house which is identified with the growth of British power in Bengal, I desire to say that the partition of Bengal is a political blunder of the greatest magnitude, and the Government should reconsider its orders and withdraw them. The prestige of the Government will not suffer by such withdrawal. Prestige is not lost lest enhanced by the frank recognition of a mistake and the withdrawal from an untenable position which is condemned by public opinion. There is no greater triunple for a Government to achieve no nobler renown to acquire, than by the exhibition of the moral courage which does not hestitute to avow a blunder and to uudo it. It is however only the strong ruler who is capable of such conduct. It is prerogative of the weak to persevere in errors under the delusion that it constitutes an unfailing index of strength. I venture to think that nobody has a greater right to speak with authority on the question of the partition of Bengal than Sir Henry Cotton; for he was connected for nearly a quarter of a century with the Secretariat and has intimate knowledge of the administrative labours and anxieties of a succession of distinguished Lieutenant Govranors. In the admirable speech which he delivered in this very Town Hall he said with all the authority which belongs to his unique experience that there has been no sensible accession to the work of the Lieutenant Governor such as he is not able to copewith. Having regard to the rapid opening up of the country in all parts and to the facilities of communication which have been established one would certainly be inclined to accept this view. I must say that from first to last no case has been made out for the partition of Bengal. Is

official opinion unanimous on the subject? It should be unanimous and this neccessity for it as clear as the noon-day scene in a case where the popular opposition to the measure is so strong and persistent and where even the final orders of Government are not accepted without a protest. Were the local officers and the Divisional commissioners of Malda and North Bengal consulted? Was the India council in London unanimous? But admitting that the Lieutenant Governor is worked, is partition in the teeth of strenuous opposition the only means of affording him relief? The "Englishman" suggested and the country endorsed the view that Bengal should be raised to the status of a Presidency Government with and Executive Council to help the Governor—that in short, the form of administration in vogue in Madras and Bombay should be adopted for Bengal. But His Exellency the Viceroy will not accept this view. He has no high opininion of the efficiency of the Presidency Governments though another high authority of much wider Indian experience and intimately acquainted with Presidency System of Government, Sir william Lee Warner, has borne high testimony to its efficiency. The fact remains that a Presidency Governor owing to his appointment to the Secretary of state more or less independent of the Government of India, and that it was a Presidency Governor Lord Ampthib who effectually opposed the application of the partition scheme to a part of the Madras Presidency and some of its districts were saved from incorporation into the Bengal Presidency. I confess I am not able to follow the resolution of Government. Seeing that we cannot hope to appeal with success for the conversion of the status of Bengal Government into that of

a Presidency Government—though this is a matter which I think our public bodies should keep steadily in view—we have but a prayer in the alternative that if partition be inevitable the Bengali speaking race should not be broken up but their unity maintained by placing them under the one and the same administration by the incorporation of the Burdwan and Presidency Divisions intno the new Province. I cannot conceive of a prayer more reasonable or moderate or one more consistent with the principles laid down by the Government itself. It is linguistic considerations that have led the Government to incorporate into the Bengal Presidency several Uria-speaking districts which had hither to formed part of the Central Provinces. If linguisticities are recognised by the Government as an inseperable bond of union in the case of the Uria-speaking population, what have the Bengalees done that they should not be so recognised in their case? If Darjeeling is to form a part of the old Province on account of associations which are cherished by both Provinces, old and new, which should the associations of centuries which knit the Bengali-speaking raee together be ruthlessly surrendered? Reason, argument the most cherished associations sanctified by ages and the overwhelming opinion of a vast population are all on our side. It is the fiat of authority irresponsive to our appeals that severs us. But we will have faith in that authority and the final judgment of English pnblic opinion, and in that faith we continue this agitation which, let it be clearly understood, is not sectional but universal is not confined to the upper classes but has gone down to the masses below, who had hither to felt little or no interest in political movements.

I desire to make one observation with regard to the jurisdictions of the High Court. That jurisdiction, we have been assured, will be maintained for the present. But there is no guarantee that it will always be maintained. I fear that in the course of time a Chief Court will be established in the new Province. And then what will become of our High Court? Thus emasculated and share of its jurisdiction and of its prestige and dignity it will, I fear, be reduced to the status of a High Court. It will naturally be told that what is good for the new Province is equally good for the old. This is a danger, which I am glad to find the chamber of commerce anticipates. It can only he averted by the withdrawal of the order sanctioning the partition of Bengal.

